দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩
১৫ মাঘ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪
website : www.eswastika.com

রাজ্যে মিড ডে মিলেও কাটমানি

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ১৫ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৩০ জানুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ভারতের কমিউনিজম্ তৈরির চেষ্টা দেশবিরোধী, বলেছিলেন নেতাজী □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দিদির সুরক্ষা কবচ কিন্তু মাদুলি নয় □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

আসন্ন বাজেটে মহাগুরুত্বের বিষয় নির্ধারণ জরুরি □ ড. ডি. সুব্বারাও □ ৮

চীনকে রুখতে প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল ব্যয়বরাদ্দ জাপানের □ বিশ্বামিত্র □ ১০

রাঁধুনি দিদি ঠিকই বলেছেন, জায়গাটা বড্ডো অন্ধকার □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১১

বঙ্গবাসীকে অমর্ত্য সেনের মজাদার চকোলেট বিতরণ □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৩

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মোদীর আত্মনির্ভর প্রকল্প দেশকে শক্তিশালী করবে □ আনন্দমোহন দাস □ ১৫

হিন্দু ও হিন্দুধর্মের অপমান বন্ধ হওয়া উচিত □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১৭

মিড ডে মিলে মাছের তেলে মাছ ভাজছে রাজ্য □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ২৩

আবাস যোজনায় নজিরবিহীন দুর্নীতি □ ভবানী শঙ্কর বাগচী □ ২৫

সত্যই ভারত-সাধনার মূলকথা □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

প্রথম ভারতীয় শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৪

মরিচঝাঁপির ৪৪ বছর : কী ছিল গণহত্যার সম্ভাব্য কারণ? □ দেবযানী ভট্টাচার্য্য □ ৩৫

সাধারণতন্ত্র দিবস ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ □ ড. শ্রীরঙ্গ গোডবোলে □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৬ ফেব্রুয়ারি
২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৬ ফেব্রুয়ারি
২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দুর্বল পাকিস্তান, দিশাহারা জঙ্গিরা

পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ১৯৭২-এর পর পাকিস্তান আরও একবার ভাঙতে চলেছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, পেট্রোল খতম, বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডারও তলানিতে। এই অবস্থায় একটাই প্রশ্ন উঠে আসছে— পাকিস্তান দুর্বল হলে কি সন্ত্রাসবাদ দুর্বল হবে?

আগামী সংখ্যায় স্বস্তিকা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে। লিখবেন— কৌশিক কর্মকার, সুদীপ্ত গুহ, সুশান্ত মজুমদার প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দুর্নীতিতে সুপার পাওয়ার

সমগ্র দেশ দেখিতেছে,পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির রক্ষকই আজ ভক্ষকে পরিণত হইয়াছে। রাজ্যের শাসকই রাজ্যবাসীর সবকিছু লুণ্ঠনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের সর্বগ্রাসী শাসন ব্যবস্থা সিপিএমের স্বৈরাচারী শাসনকেও বহু যোজন পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে। সিপিএমের সিন্ডিকেটরাজের সর্বেসর্বা হওয়া হইতে শুরু করিয়া দুর্নীতির সর্বক্ষেত্রে শাসকদল আজ সুপারপাওয়ার। যেকোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রকল্পের সুবিধা গরিব মানুষের পাওয়ার ক্ষেত্রে, মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে তাহারা মানুষের উপার্জিত অর্থ শোষণ করিয়া লইতেছে। এমনকী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং স্কুল পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের টাকারও তাহারা কাটমানি খাইয়াছে। গরিব মানুষের রক্ত চুষিয়া তাহাদের চুনোপুঁটি নেতা হইতে বড়ো বড়ো নেতা ও মন্ত্রীও আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। যোগ্য চাকুরিপ্রার্থীদের চাকুরি চুরি করিয়া তাহাদের বশংবদ কাহাকেও মোটা টাকার ঘুষের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া টাকার পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী শাসনে কিছুদিন আগেও মানুষ প্রতিবাদ করিতে ভয় পাইত। প্রতিবাদী কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত। এই কাজে তাহারা জেহাদি শক্তিকে দোসর করিয়াছে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর তাহারা বহু প্রতিবাদী মানুষকে শুধু ঘরছাড়াই করে নাই, নির্বিচারে মা-বোনেদের সম্মানহানিও করিয়াছে। তাহাদের লাগামছাড়া অত্যাচার ও দুর্নীতিতে মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়া গিয়াছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ ভয় না পাইয়া প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছে। দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের জনতার হাতে হেনস্থা হইতে হইতেছে। প্রকাশ্যস্থানে জনতা তাহাদের বেআব্রু করিয়া ছাড়িতেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন, ইহা বিরোধী দলের চক্রান্ত। কিন্তু ইহা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, সর্বপ্রকার দুর্নীতিতে বর্তমান শাসকদল জড়িত। এবং তাহা দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর নির্দেশেই। এক বৎসর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার দলীয় সভায় বলিয়াছিলেন কাটমানির টাকার পঁচাত্তর শতাংশ পার্টির ফান্ডে দান করিয়া পঁচিশ শতাংশ নিজের কাছে রাখিতে হইবে। সততার নাম করিয়া রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করিয়া সততার সদিচ্ছা তিনি দেখাননি। আর তাহাতেই উৎসহিত হইয়া তাঁহার দল দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারই দলের একজন বিধায়ক স্বীকার করিয়াছেন যে, তৃণমূল দলের সবাই গলা অবধি দুর্নীতিতে ডুবিয়া রহিয়াছে। ইহার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হইল দলের মহাসচিব তথা রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং পরে শিল্পমন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার হইয়া জেলজীবন ভোগ করিতে হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, শাসকদলের নেতা তথা শিক্ষাদপ্তরের কয়েকজন আধিকারিকও দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। দুর্নীতির আরও প্রমাণ হইল টেট উত্তীর্ণ চাকুরিপ্রার্থীদের দিনের পর দিন রাজপথে বসিয়া অবস্থানে শামিল হওয়া। তাহাদের কাটমানির সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্তটি হইল মিড ডে মিলের বরাদ্দ হইতে চুরি। মিড ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলাদের বক্তব্য হইল, তৃণমূল নেতা প্রধান শিক্ষককে প্রতি মাসে মিড ডে মিলের বরাদ্দ হইতে দুই হাজার টাকা দিতে হয়। তাহারই পরিণতিস্বরূপ মিড ডে মিলে পোকা, আরশোলা, ইঁদুর ও টিকিটিকি মিলিতেছে। ব্যাপক দুর্নীতির ফলে সমগ্র দেশের সামনে এই রাজ্যের কঙ্কালসার চেহারাটি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রাজ্যবাসীর পক্ষে ইহা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় বই কী!

ক্ষমতায় আসিবার অব্যবহিত পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বৈরাচারের নখ-দন্ত বাহির করিয়াছিলেন। তাহা করিতে তিনি রাজ্যের সরকারি আধিকারিক এবং কিছু পুলিশকর্মীকে দলদাসে পরিণত করিয়াছেন। কেহ প্রতিবাদ করিলেই তাহাকে মাওবাদী বলিয়া দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, কৃষক, নিরীহ গৃহবধূ,কেহই ছাড় পান নাই। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হইয়াছেন তৃণমূল নেত্রী।ইদানীং মানুষের অভিযোগ ও বিক্ষোভকে গুরুত্ব না দিয়া বিজেপিরই ভূত তিনি দেখিতেছেন। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সোচ্চার বলিয়া দিতেছে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান সমাগত। দুর্নীতিপরায়ণ এই শাসকের বিদায় হইলেই রাজ্য ও রাজ্যবাসী লজ্জা ও কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবে।

সুভাষিতম্

গতে শোকো ন কর্তব্যো ভবিষ্যং নৈব চিন্তয়েৎ

বর্তমানেন কালেন বর্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।।

বিগত হওয়া বিষয়ে শোক করা উচিত নয় এবং ভবিষ্যতের জন্যও চিন্তিত থাকা উচিত নয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি বর্তমানকে ভেবেই কাজ করে যান।

ভারতে কমিউনিজম তৈরির চেষ্টা দেশবিরোধী, বলেছিলেন নেতাজী

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২৪ জানুয়ারি ১৯৩৮ : সাংবাদিক আর তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তকে লন্ডনের 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জানিয়েছিলেন তাঁর কমিউনিজম আর ফ্যাসিজমের ব্যাখ্যা খুশি হওয়ার মতো নয়। তিনি বলেন, 'ভারতের সংগ্রাম' বইটা লেখার সময় ভারতে কমিউনিজম তৈরির চেষ্টা তাঁর 'দেশ বিরোধী' বলেই মনে হয়েছিল। ওই সাক্ষাতে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সমর্থন তিনি মেনে নিয়েছিলেন। দত্ত পরে তিন বছরের জন্য ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে কমিউনিস্টরা নেতাজীর বিরুদ্ধে বহু কুবাক্য ব্যবহার করে তাঁকে অপমান করে প্রমাণ করে যে তাদের সম্পর্কে নেতাজীর ধারণা সঠিক ছিল। তারও প্রায় ৪০ বছর পর তাদের ঘুম ভাঙে। বামফ্রন্ট তৈরি করে ফরোয়ার্ড ব্লককে সঙ্গী করে। তাদের নেতাজীমূল্যায়ন ভুল বলে তারা স্বীকার করে নেয়। আমার মতে তা কেবল ভুল ছিল না ছিল এক লজ্জার অধ্যায়। সে লজ্জা আজও কমিউনিস্টদের পিছু ছাড়েনি।

আমাদের আগের প্রজন্মের এক বিখ্যাত সাংবাদিক বাম জমানায় তাঁর বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় 'লাল পতাকা লজ্জার পতাকা' বলে একটি সম্পাদকীয় ছেপে নকশালি অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। জনৈক জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক সে লেখা লিখেছিলেন। শুনেছিলাম অনেকদিন তিনি নাকি বাড়ি থেকে বেরোতে পারেননি। আমি তাঁকে চিনতাম। এখনকার শহুরে নকশালদের বাড়বাড়ন্ত যে রয়েছে কিছুদিন আগেই তা নিয়ে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন সিরাজদৌল্লার দেশভক্তি ছিল কিন্তু কূটবুদ্ধি ছিল না। ফলে ক্রূরবুদ্ধি সাহেবরা তাকে সহজেই কায়দা করে হারিয়ে দেয়। এখন কেবল কূটবুদ্ধি আর মিথ্যা ছলাকলার রাজনীতি। রাজনৈতিক আদর্শ ঘিরে তাত্ত্বিক বিতর্ক বা আলোচনার পাট চুকে গিয়েছে। রাজ্য-রাজনীতির ক্রমাগত অবমূল্যায়ন ঘটে চলেছে। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মদিনকে অনুপ্রেরণা করেই এ লেখা। রাজ্য- রাজনীতিতে যে ধরনের দুর্নীতির পচন ধরেছে তাতে নেতাজীর মতো আলোকবর্তিকা রাজ্যের সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অন্যতম শেষ আশ্রয় বলেই আমার ধারণা। তাই তাঁর স্মরণ নিলাম। এখন তিনি আদর্শ আর রাজনৈতিক মূল্যবোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দূত। তাঁর রেখে যাওয়া রাজনীতি যে শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে লুম্পেন আকার ধারণ করবে আমার মনে হয় তিনি বা সেই সময়ের কোনো নেতাই ভাবতে পারেননি। রাজ্যের রাজনীতিতে ভাষা সন্ত্রাস কী ধরনের নীচতা আর বেহায়াপনায় পরিণত হয়েছে তা নিয়ে আগেই লিখেছি। তাই পাঠকদের আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

সবাই জানেন শাসক দুর্নীতির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে এই রাজ্যে। ভোটের মাধ্যমে বিরোধী শক্তি সে দুর্নীতির চাক যতক্ষণ না ভাঙছে শাসকদের সংবিত ফেরার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয় না। বিরোধীদের কাছে সে চাক ভাঙার প্রথম সুযোগ রয়েছে পঞ্চায়েত ভোটে প্রায় ১৫০টি বিধানসভার গ্রামীণ আসনে আর ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে। এক বন্ধু তো বলেই দিলেন, 'এখন পশ্চিমবঙ্গে বাস আর পচা ডোবায় বাস সমার্থক।' বাম শাসনের শেষ বেলায় লুম্পেন রাজনীতির আমদানি করেছিল শাসক সিপিএম। সিপিএমের সঙ্গে ৩৪ বছর ধরে লড়াই করতে করতে সেই লুম্পেন রাজনীতির শিকার হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। কয়েক মাস পরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন আর তাই সিপিএমের কাছ থেকে ধার করা শিক্ষা দিয়েই তার ব্যবহারে উদ্যত হয়েছেন মমতা। তাই তৃণমূল নেতারা বলে বেড়াচ্ছেন সিপিএমকে বাড়তে দিলে তারা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ভোট কাটবে আর তাতে লাভ হবে তৃণমূলের। তৃণমূল নাকি সেরকম গোপন ছক বানিয়েছে। জনমানস সর্বদা উলটো পথে চলে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সিপিএমকে আক্রমণ করেন রাজ্যের সাধারণ আর ভোটার মানুষ খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিপিএমের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বা তাদের প্রতি অন্যায় হচ্ছে ধরে নিয়ে বিজেপিতে চলে যাওয়া ভোট সিপিএমে ফিরিয়ে দেবে। তাতে তৃণমূলের বৃদ্ধি ঘটবে। আর বিজেপি বিপাকে পড়বে। অর্থাৎ 'রামের ভোট আবার বামে' ফিরে আসবে। আর ফাঁকতালে তৃণমূল লাভের গুড় খেতে পাবে। কথাটা বেঠিক নয়। ইদানীং তৃণমূলের মুখপত্র আর সমর্থক কাগজ ও টিভি চ্যানেলরা তাই প্রচার করছে। একেই বলে 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি'। তৃণমূলের বোধহয় তাই হয়েছে।□

দিদির সুরক্ষা কবচ কিন্তু মাদুলি নয়

দূতপ্রেরকেষু দিদি,

ক্ষোভ-বিক্ষোভ ঠিক ছিল, তা বলে একেবারে গ্রামে ঢুকতেই দেওয়া হবে না! এত সাহস পান কোথা থেকে এঁরা? আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না। ভয়ডর বলে কি কিছুই নেই!

দিদি আপনি নিশ্চয়ই ওই দেওয়াল লিখন পড়েছেন। 'মন্ত্রী ও নেতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ পাড়ায়।' পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই মর্মে দেওয়ালে লিখন দেখা গিয়েছে এলাকায়। মালদহের জেলা সদর শহর ইংরেজবাজার থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে পুরাতন মালদহ ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁসিপাড়া এলাকার বাসিন্দারা এমনই ফরমান জারি করেছেন।

কেন এই ফরমান? গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁদের এলাকার রাস্তা যাতায়াতের অযোগ্য। রাস্তা ভালো করার দাবিতে একাধিক বার বিক্ষোভ করেছেন। পথ অবরোধও করেছেন। কিন্তু মিলেছে কেবল প্রতিশ্রুতি। স্থানীয় নেতা থেকে মন্ত্রী ও সাংসদের বাড়িতে তাঁরা গিয়েছেন। পেয়েছেন কেবল আশ্বাস। তার মাঝেই রাজ্য সরকারের তরফে 'দিদির দূত' কর্মসূচি শুরু হয়েছে। স্থানীয় নেতা-মন্ত্রীরা গ্রামবাসীদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাঁদের অভাব- অভিযোগ শুনছেন। এই গ্রামেও 'দিদির দূত'রা আসবেন— এই খবর চাউর হতেই পাঁসিপাড়ায় শুরু হয় দেওয়াল লিখন। লেখা হয়, 'নেতা-মন্ত্রীদের এই পাড়ায় প্রবেশ নিষেধ।'

ওই গ্রামের বাসিন্দা ললিতা চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'আমাদের গ্রামে কিছুই নেই। 'দিদির দূত'-দের তাই ঢুকতে দেব না। ভোটও দেব না।' কাগজে পড়েছি, গোপাল ঋষি নামে আর এক স্থানীয় বাসিন্দার সুরও একই। তাঁর কথা, 'পঞ্চায়েত ভোট আসছে। নেতা-মন্ত্রীরা মিটিং করছেন। এলাকায় এলাকায় ঘুরছেন। কিন্তু ৩ বছর ধরে যে পঞ্চায়েত সদস্যরা আছেন, তাঁরা তো কোনও কাজ করেননি। রাস্তা হয়নি। জলের ব্যবস্থা করেনি। আলো ও নিকাশি ব্যবস্থাও নেই। তাই ওঁদের প্রবেশ নিষেধ।'

এ নিয়ে দিদি আপনার দলের লোকেরা কিন্তু ঠিক কথাই বলছেন। মালদহের তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সি বলেছেন, 'অভাব-অভিযোগ শোনার জন্যই তো এমন (দিদির দূত) কর্মসূচি। গ্রামবাসীদের ক্ষোভ প্রশমিত হবে। সমস্যার সুরাহা হয়ে গেলে গ্রামবাসীদের ক্ষোভও প্রশমিত হয়ে যাবে।' তবে দিদি বিজেপি এর পিছনে থাকতেই পারে। রোজ রোজ সরকারের দুর্নীতি তুলে ধরে যে ভাবে ওরা কুৎসা করছে যে তাতে মানুষও দোটানায়। নিজের দিদি খারাপ কাজ করলেও কি বলা যায় নাকি! এই সহজ সত্যটাই অনেকে বুঝতে চাইছে না।

দেওয়াল লিখন নিয়ে মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলছেন, 'দিদির ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। আবার হয়তো প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিয়ে কাটমানি তোলার ফন্দি করেছেন দিদির ভাইয়েরা। তাই 'দিদির দূত'দের গ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে প্রচার করছেন এলাকাবাসী।' এটা কিন্তু মারাত্মক কথা। সেদিন শুনলাম বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সুরক্ষা কবচকে 'সুরক্ষা মাদুলি' বলেছেন। এ কী কথা!

সব জেলাতেই কিন্তু বিক্ষোভ চলছে। সবচেয়ে বেশি আবার অনুদাদার বীরভূমে। শতাব্দীদিদি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই বিক্ষোভ চলছে। এটা আমার একদম ভালো লাগছে না। আপনারও যে ভালো লাগছে না সেটাও আমি বুঝেছি। তা না হলে আপনি নেতাজীর জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে গিয়ে ওই প্রসঙ্গ তুলবেন কেন?

'রাস্তা দিয়ে গেলে মানুষ কিছু বলবে না, তা নয়। ক্ষোভ থাকতেই পারে। মানুষের কিছু জানানোকে বিক্ষোভ বলে না।' বিরোধীরা জনপ্রতিনিধিদের ঘিরে জনগণের এই ক্ষোভকে শাসকের বিরুদ্ধে 'অনাস্থার প্রতিফলন' বলে দাবি করলেও, আপনার কথাতেই স্পষ্ট যে, আপনি এগুলোকে 'বিক্ষোভ' হিসেবে মানতে নারাজ। এ বিষয়ে অবশ্য আগেও মুখ খুলেছিলেন আপনি। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির সভায় 'দিদির দূত'দের ঘিরে বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সমস্যা থাকলে নিশ্চয়ই বলবেন, সমাধান হবে। কারও কথা শুনে কুৎসা-অপপ্রচারে কান দেবেন না।'

আপনি এসব বলে দেওয়ার পরেও বিক্ষোভ কিন্তু কমছে না। এঁদের সাহসের বলিহারি দিদি। এখন আবার কিনা গ্রামেই ঢুকতে দেবে না বলছে। সত্যিই কি মেনে নেওয়া যায়! □

অতিথি কলম

ড. ডি. সুব্বারাও

আসন্ন বাজেটে মহাগুরুত্বের বিষয় নির্ধারণ জরুরি

৮ বছর যারা ক্ষমতায় রয়েছে তারা নিজেদের কাজকর্মের নিরিখেই নির্বাচনে লড়বে, নতুন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে নয়। বিশেষ করে বিনামূল্যে (প্রধানমন্ত্রীর কথায় রেভড়ি) কিছু বিতরণ বা খরচা মকুব করার চটকদার প্রতিশ্রুতিতে তো নয়ই।

প্রত্যেক বছরেই সরকারকে বাধ্যতামূলক ভাবেই বাজেট প্রকাশ করতে হয়। দেশের একটি বছরের আয়-ব্যয় কীভাবে পরিচালিত হবে তার আগাম একটি হিসেব নিকেশ প্রস্তুত না করে রাখলে দেশের অর্থনীতি সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে। এই প্রস্তুতি পর্বে অর্থমন্ত্রীর পথের বাধা কী কী, কতদূর জনপ্রিয়তা ও সমর্থন বাজেটের মাধ্যমে সরকারের দিকে আকর্ষণ করা যেতে পারে এই বিষয়গুলি নিয়ে অর্থমন্ত্রীর তরফে খুবই সন্তর্পণে বারবার বিবেচনা করতে হয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বতন গভর্নর দেবুরি সুব্বারাও তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি খোলা চিঠিতে সাজেশন দিয়েছেন। সেটি প্রকাশ করা হলো ।

মাননীয়া অর্থমন্ত্রী, আমি খুব ভালোই জানি এই সময় আপনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ চিঠি চাপাটি, মেলের চাপে প্রায় ডুবে যাচ্ছেন। উল্লেখিত বস্তুগুলি নির্দেশমূলক— বাজেটে কী করলে ভালো হয় আর কী করা ঠিক হবে না তাই নিয়ে। এই ক্ষেত্রে স্বভাব ও দীর্ঘদিনের অর্থনীতির ভূমিতে বিচরণ করার ফলে আমিও নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। দয়া করে আমার এই খোলা চিঠিটি বিচার করবেন।

বাজারে এই কথাটি খুবই আলোড়িত হচ্ছে যে ২০২৪ সালে নির্বাচনী বছরে সম্পূর্ণ বাজেট যেহেতু পেশ করা যাবে না তাই বাজেট জনমুখী করার জন্য এবারেই আপনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। তবে, আমি নিশ্চয় একটু অবাক হব যদি আপনি সত্যিই সেটা করেন। এই বিশ্বাসটি আমার জন্মেছে বিগত মহামারীর সময় আপনার খরচের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংযম প্রদর্শনে। যেখানে খরচের প্রয়োজন কম সেখানে না করে কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের জায়গাতেই আপনি খরচ করেছিলেন। সে কারণেই মনে হয় এবারের আপনি আপনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিপরীতে গিয়ে দান-ধ্যানের বাজেটে মন দেবেন না। নিজস্ব নির্ধারিত শৃঙ্খলাকে ভাঙবেন না।

তাছাড়া একটি সরকার যারা ৮ বছর ক্ষমতায় রয়েছে তারা নিজেদের কাজকর্মের নিরিখেই নির্বাচনে লড়বে, নতুন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে নয়। বিশেষ করে বিনামূল্যে (প্রধানমন্ত্রীর কথায় রেভড়ি) কিছু বিতরণ বা খরচা মকুব করার চটকদার প্রতিশ্রুতিতে তো নয়ই। যদি আপনি এটা করেন সেক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হবে যে আপনার সরকার এতদিন অর্থনীতি ক্ষেত্রে যতটুকু সাফল্য পেয়েছে তাতে আপনার আস্থা নেই।

(১) উন্নয়নের হারের মধ্যে কী সংগুপ্ত আছে— আমরা সামগ্রিক অর্থনীতির চিত্রটিকে বার্ষিক ৭ শতাংশ উন্নয়নের হার বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়াটা গোটা বিশ্বের এত বড়ো অর্থনীতির পক্ষে দ্রুততম হিসেবে প্রথম। আমরা আজ এত দ্রুত অগ্রসর হতে পারছি তার কারণ কোভিড মহামারীর সময় আমরা বিপুলভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। তুলনামূলক ভাবে কিছু কিছু দেশ কোভিড পূর্বের উন্নয়ন হার ফিরে পেলেও আমাদের একটু বাকি আছে। কিন্তু এর মধ্যে চিন্তার কারণ হচ্ছে ২০২১-২২-এর গড় আয় মহামারী পূর্ব ২০১৮-১৯-এর থেকে কম হয়েছে। এই নিম্নগামিতার চাপ মূলত বহন করতে হয়েছে নিম্ন আয়সীমার মানুষকে। এই কারণেই আপনার বাজেটের মূল ফোকাস হবে বৃদ্ধি। আবার এই এক শব্দের সোপানটিকে ছুঁতে গেলে আর একটি শব্দ লাগবে তা বিনিয়োগ। সকলেই জানেন আজকের বিনিয়োগের বীজ বপনের ফসলই হবে আগামীকালের বৃদ্ধি। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গত ২ বছরে যেহেতু বেসরকারি বিনিয়োগ আশানুরূপ হয়নি সরকারের তরফে বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি সঠিক কারণেই হতাশ হয়েছেন, কেননা বিগত কয়েক বছরে বেসরকারি বিনিয়োগ যেমন বিপুলভাবে বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছিল সেটা হয়নি। বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা শেষমাত্রায় পৌঁছলে তারা অবশ্যই বাড়তি উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই মধ্যবর্তী সময়ে দেশে উৎপাদন প্রক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় চালু রাখতে গেলে সরকারি উদ্যোগের খরচ বাজেটে অনুমোদন করাতেই হবে।

(২) চাকরির সম্ভাবনা তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— আমি নিশ্চিত আপনি এই বাজেটে চাকরি সৃষ্টির ওপর ব্যাপক জোর দেবেন। জনসংখ্যার মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে নীচের ধাপে থাকা মানুষদের চাকরিই অর্থনীতিকে ওপরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর তাদের আয়ের পরিমাণ বাড়লেই তাদের খরচের প্রবণতায় বৃদ্ধি আসবে। আর ভোগ্য বস্তুর ওপর খরচ বৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতির বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। এখান থেকেই আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সোনালি রেখা শুরু। অবশ্যই বেকারত্বের মতো এত বিপুল ও জটিল সমস্যার চটজলদি

সমাধানের আশা সর্বদাই দুরাশা। এক্ষেত্রে তাই সামগ্রিক অর্থনীতিতে দরকার চাকরিকেন্দ্রিক উন্নয়ন বা বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে সার্ভিস সেক্টর নিশ্চয় অর্থনীতিকে সাহায্য করবে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সমাজের নীচু তলার দিকে যেখানে উচ্চ শিক্ষা ততটা বেশি নয় সেখানে একটি নীচু কর্মের শ্রমের হাতে-কলমে কাজ বেশি দরকার। কেননা আমাদের কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাটা প্রচুর। এর ফলে চাকরি তৈরির শেষ বৈতরণী কিন্তু সেই উৎপাদন ভিত্তিক শিল্প অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং।

(৩) উৎপাদন শিল্প ও রপ্তানি ব্যাপক সাহায্যকারী। সরকারের প্রবর্তিত PLI (Production Link insurance) দেওয়ার ফলে চাকরি তৈরির সম্ভাবনা নিশ্চয় বেড়েছে। কিন্তু এই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে MSME (micro, small & mediun enterprise)-এর সঙ্গে কাঁচামাল ও finished goods তৈরি অবধি হাত মিলিয়ে চলতে পারে এমন সংস্থার ওপর জোর দিতে হবে। এগুলি খুবই ছোটোখাটো চাকরি ভিত্তিক। এমন একটা বিপুল শ্রমভিত্তিক শিল্প তৈরি সংক্রান্ত একটা উদাহরণ দিচ্ছি খেলনা শিল্প। এখানে বেশি উৎসাহ দিলে বহু নতুন চাকরির সঙ্গে কাঁচামাল থেকে মনোহারী খেলনায় রূপান্তরিত value added product হয়ে যাবে। চাকরি তৈরির আর একটি পথ হচ্ছে রপ্তানি। এর কারণ রপ্তানির জন্য উৎপাদন অধিকাংশই শ্রমনিবিড়। এক্ষেত্রে আমি কোনো নতুন ইনসেন্টিভ দিতে বলছি না। কেবল প্রতিবন্ধকতাগুলিকে হটিয়ে দিতে বলছি। রপ্তানির ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই নানা যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয় যেগুলির ওপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য আছে। এই শুল্ক এই আমলেও রয়েছে। তাহলে আমদানিকৃত বস্তুর ওপর যত বেশি শুল্ক চাপবে আদতে রপ্তানি মূল্যও বেড়ে যাবে। প্রতিযোগিতার বাজারে দাম বাড়লে আমাদের মাল পিছিয়ে পড়বে। এই জন্যে import duty কমানো নির্দিষ্ট জিনিসের ওপর অবশ্যই জরুরি, আমদানি শুল্কে যা ক্ষতি হবে অন্য কর থেকে উঠে আসবে আর রপ্তানি বাণিজ্য ও সে সম্পর্কিত উৎপাদন শিল্পও বাড়বে।

(৪) সামগ্রিক অর্থনীতির ঘাটতি মেটানোর উপায়গুলির স্বচ্ছতা— সারা দেশের লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে চাকরিবাকরি ক্ষেত্রে সুরাহার জন্য আপনার ওপর প্রত্যাশা রাখবে। কিন্তু সারা বিশ্বের অর্থনীতি ক্ষেত্রের যোদ্ধা ও দিল্লি-মুম্বাইয়ের চর্চাকারীরা একটি বিষয়ের ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, আপনার রাজস্ব খাতে ঘাটতি কত (fiscal deficit)। মোট আয় ব্যয়ের পার্থক্য। অবশ্যই এটি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই মহা গুরুত্বপূর্ণ। এটি সরকারি সামগ্রিক কোষাগারের অবস্থার সূচক।

আপনার দু' বছর আগের বাজেট পেশের সময় সামগ্রিক জিডিপি-র সঙ্গে রাজস্ব ঘাটতির মাত্রা ২০২৫-২৬ এর মধ্যে ৪.৫ শতাংশে বেঁধে রাখবার কথা বলেছিলেন। আমার মতে আপনার ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে যদি আপনি সেই লক্ষ্যপূরণে আরও উপকরণ যোগ করতে পারেন। অন্যদিকে চলতিখাতে (reveric) যে ঘাটতি রয়েছে সেটিকে মুছে ফেলার জন্য কিছু পরিকল্পনা নেওয়াও আবশ্যিক।

একজন প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ হয়ে আপনি নিশ্চয় জানেন চলতি খাতে ঘাটতি শূন্যে নামিয়ে আনতে পারলে রাজস্ব খাতের ঘাটতিতেও অনেকটা স্থিরতা আশা করা যায়।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয়তা ও বিনামূল্যে বিতরণ (freebies)—এখন মানুষকে প্রায় দানের পদ্ধতিতে আকর্ষণের এক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি দুটি আবেদন করব। প্রথমত কেন্দ্র প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রেই সেস বা surcharge আদায় করে থাকে। এই আদায়ের বিষয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ রয়েছে, সেগুলি খুব অসঙ্গত নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই বিষয় নিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে আরও আলোচনা, মত বিনিময় করা দরকার। এর কারণ বিরোধের উৎসে রয়েছে সেস বা সারচার্জের সবটাই কেন্দ্রের কাছে চলে যায় রাজ্য কোনো ভাগ পায় না। সৎভাবে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালে রাজ্যগুলির কাছে শুভ সঙ্কেত যাবে যে সরকার ব্যবসাদারি করে সব নিয়ে যাচ্ছে না, তারা অংশীদারিত্বেই বিশ্বাসী। এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথা আরও ক্ষমতাবান হবে।

প্রধানমন্ত্রী যে রেভড়ি (freebies) সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্তের কথা বলেছেন সে বিষয়ে আপনি রাজ্যগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় কিনা এ নিয়ে আলোচনার সূচনা করতে পারেন।

পরিশেষে অবশ্যই বলব আমার মতো আরামকেদারায় বসে বহু ধরনের উপদেশ দিতে কোনো বাধা না থাকলেও বাস্তবে তার রূপায়ণে প্রচুর বাধা থাকে। আপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে থাকা মানুষের কাছে জনগণের বিচিত্র চাহিদা আছড়ে পড়বে যার সমাধান আপনাকেই স্থির করতে হবে। অবশ্য এই জন্যই তো যোগ্য নেতাকেই আমরা নির্বাচন করি। মাননীয়া, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের আন্তরিক সাফল্য কামনা করি।

(লেখক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর)

শোকসংবাদ

মালদহ জেলার সংস্কৃতভারতীর জেলা সংযোজিকা তাপসী মণ্ডলের মাতৃদেবী ভারতী মণ্ডল গত ১৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। কয়েকদিন আগে আগুন পোহাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ৩ কন্যা, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

চীনকে রুখতে প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল ব্যয়বরাদ্দ জাপানের

ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনকে ঠেকাতে প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল ব্যয়বরাদ্দ করতে চলেছে জাপান। বাংলাদেশের 'প্রথম আলো' সংবাদপত্র সূত্রের খবরানুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বরে জাপান তাদের নতুন সামরিক নীতির ঘোষণা করে। তাতে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ করা হবে। এতে খরচ পড়বে প্রায় বত্রিশ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। প্রতিরক্ষা খাতে হঠাৎ কেন এই বিপুল বৃদ্ধি? সমরবিদেরা মনে করছেন, বহুকাল ধরে জাপান তার শান্তিবাদী প্রতিরক্ষা নীতির শর্ত পালন করে আসছে। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ব্যয় দেশের মোট জিডিপির এক শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রতিরক্ষা খাতে এই কম খরচ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় করতো জাপান। ফলে সামরিক ক্ষেত্রের পরিবর্তে অর্থনৈতিক উন্নতিকে মাপকাঠি করে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল তারা। কিন্তু চীনের আগ্রাসী পদক্ষেপের মোকাবিলায় আপাতত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ছাড়া গত্যন্তর দেখছে না টোকিয়ো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর সামরিক ক্ষেত্রে এতো বিপুল খরচ জাপান করেনি। এর ফলে আমেরিকা ও চীনের পর জাপান বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাজেটের দেশ হতে চলেছে।

তাদের প্রতিরক্ষা বাজেটের মধ্যে আমেরিকা থেকে টমাহক ক্রুজ মিসাইল ও অন্যান্য হাইপারসনিক অস্ত্রখাতে ব্যয় করতে চলেছে জাপান। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির পেছনে সম্প্রতি আততায়ীর গুলিতে নিহত ভারতের বন্ধুস্থানীয় জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর আমলেই জাপান প্রতিরক্ষা ব্যয় প্রায় ১০ শতাংশ বাড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবার জাপান সামরিক বাহিনীকে দেশের বাইরে মোতায়েন করার জন্য তাদের ওপর আমেরিকার আরোপিত 'শান্তি সংবিধান'-এর পুনরায় পর্যালোচনা করেছে। জাপানের সংবিধানের যে নয় নম্বর অনুচ্ছেদ জাপানকে 'হুমকি দেওয়া ও বলপ্রয়োগ' থেকে বিরত রাখে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে সেই অনুচ্ছেদটি সংশোধন করারও প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জাপানের একাংশের বিক্ষোভে তাঁর সেই প্রয়াস সফলতা পায়নি।

যাইহোক, সেদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবের মতো কোনো বিক্ষোভের মুখে পড়েননি। বরং জনমতের ভিত্তিতে দেখা গেছে, বেশিরভাগ জাপানি নাগরিক সামরিক শক্তি গঠনকে সমর্থনই করছেন। কিশিদা যখন জাপানের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁকে 'শান্তির পায়রা' নামে অভিহিত হতেন। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। এই অবস্থান পরিবর্তনের কারণও অজানা নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে চীনের তাইওয়ানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর আশঙ্কা তীব্র হয়েছে; আর তাইওয়ান হলো কার্যত জাপানি দ্বীপপুঞ্জের একটি সম্প্রসারিত দ্বীপরাষ্ট্র। গত বছরের আগস্টে তাইওয়ানের আশপাশের জলসীমায় সামরিক অনুশীলনের সময় চীন যে নয়টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল তার মধ্যে পাঁচটি জাপানের সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে এসে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই জাপান তাইওয়ানের নিরাপত্তাকে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। ভারতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের পেশিশক্তি প্রদর্শনের বিরোধিতায় শুধুমাত্র জাপান যে সক্রিয় হয়েছে, তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতও একই রাস্তায় হাঁটছে। ওই অঞ্চলে চীন এখন সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথার কারণ। তারই পরিণতি হিসেবে পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্তে জাপানের মিত্র দেশগুলোর মধ্যেও জাপানের মতো সামরিকীকরণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যেমন, জার্মানি তার প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২ শতাংশ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং ইউরোপে সামরিক নেতৃত্বে ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। ইংল্যান্ড ইতিমধ্যেই সামরিক ব্যয় জিডিপির ২ শতাংশ স্তর অতিক্রম করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তার প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আমেরিকাও ইতিমধ্যেই বিশাল সামরিক ব্যয় ৮ শতাংশ বাড়িয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই জাপানের পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত হওয়া পূর্বের যে কোনো কালের থেকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও মনে করা হচ্ছে, এটি চীনের সম্প্রসারণবাদী গতিকে থামানোর জন্য যথেষ্ট হবে এমন সম্ভাবনা কম। সমর বিশেষজ্ঞরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, ২০২০ সালে কোভিডের সময় চীনের সেনাবাহিনী পিপলস লিবরেশন আর্মি (পিএলএ) কীভাবে জোর করে বিস্ময়করভাবে ভারতের হিমালয়ের সীমানায় ঢুকে পড়ে। সেখানে এখানো মাঝেমধ্যেই ছোটোখাটো সংঘর্ষ হচ্ছে। সাধারণত সশস্ত্র সংঘাত এড়িয়েই চীন অন্যের ভূখণ্ড চুরি করে; তার ওপর একতরফাভাবে দক্ষিণ চীন সাগরের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র এঁকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সীমানা দাবি করে চীন। এই কায়দায় চীন ভুটানের জমি দখল করেছে। বেজিং সরকার হংকংয়ের স্বায়ত্তশাসনকেও ধ্বংস করতে সফল হয়েছে।

এখন চীনের লক্ষ্য জাপানের শাসনাধীন থাকা সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ দখল করা। চীনের ছক জাপানের সুপরিচিত। তাই আপাতত তারা তাদের প্রতিক্রিয়া সংযতই রেখেছে। অন্তত এখন পর্যন্ত কোনো জাপানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেনকাকু দ্বীপ পরিদর্শন করেননি, পাছে তা চীনকে ক্ষুব্ধ করে। তবে জাপানের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র এবং হাইপারসনিক অস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করা চীনের হাইব্রিড যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা কোনো সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় জাপানকে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঝুঁকি এড়িয়ে চীনের কৌশলেই তাকে বধ করার উপায় খুঁজতে হবে বলে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ▯

রাঁধুনি দিদি ঠিকই বলেছেন, জায়গাটা বড্ডো অন্ধকার

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বাঙ্গালির সঙ্গে টিকটিকির যোগ বহুদিনের। টিকটিকি ঠিক কোথায় কোথায় পড়লে কী কী হতে পারে তা বাঙ্গালির এক মিথ ফিরিস্তি। যেমন ধরুন, টিকটিকি যদি হাতে পড়ে তাহলে আপনি নির্ঘাত সম্মানিত হতে চলেছেন। যদি মাথায় পড়ে তবে প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হতে চলেছেন। যদি বাম কাঁধে পড়ে তবে আয়ু বাড়বে। খেতে বসে যদি টিকটিকির শব্দ পান তবে এই বোধহয় সুখকর খবর আসছে। খাবার সময় যদি পায়ের ওপর টিকটিকি পড়ে তবে তা শারীরিক অসুস্থতার বার্তা। কিন্তু কথা হচ্ছে, যদি খাবারের মধ্যে টিকটিকি পড়ে? যদি খেতে গিয়ে তাতে টিকটিকির হদিস মেলে? তখন তা কীসের লক্ষণ? আজ আমরা সবাই টিকটিকির ভূমিকায়। খাবারের মধ্যে টিকটিকির উপস্থিতি কীসের সিম্পটমস তার খোঁজ করছি। চূড়ান্ত নৈরাজ্য, শৈথিল্য, গাছাড়া ভাব, নমো নমো করে কাজ সারা, গাফিলতি, দরদহীনতা এবং আরও যা যা প্রকারের দায় সারা উপমা হয় তার সব জড়ো করে বলা যায়— মিড ডে মিলে টিকটিকির উপস্থিতি তারই লক্ষণ। এই দেখুন! টিক টিক টিক করে উঠল। প্রচলিত বিশ্বাস, টিকটিকির শব্দ করা মানে যা বলছি তা ঠিক, সত্যি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার মিড ডে মিল নিয়ে একাধিক অপেশাদারি গা ঢিলেমি আচরণ বহু বছর ধরে করছে। কিছু ছবি সংবাদে এসেছে, অনেক কিছুই আসেনি। কিন্তু এবার যা নজরে এলো তাতে আমাদের কান যেন টিকটিকির মতোই হয়ে গেল— এদিক থেকে ওদিক দুদিক যেন খুলে গেল। এই তো কিছুদিন আগে যখন পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মাইসরা এলাকায় শ্যামপুর আই সি ডি এস স্কুলের রান্না করা খিচুড়িতে টিকটিকির দেখা মিলল। আবার একই ঘটনা ঘটল মালদহ জেলার মিড ডে মিলে, মালদহ চাঁচলের সাহোরগাছি বিদ্যানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পাঁশকুড়া স্কুলের রন্ধনকারী বলেই ফেললেন, রান্নার জায়গাটায় বিদ্যুৎ নেই, বড্ডো অন্ধকার। আমাদের আর টিকটিকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে না। রাঁধুনি দিদি একেবারে খাঁটি কথাই বলেছেন— বড্ডো অন্ধকার। যে অন্ধকারে বিন্দুমাত্র দায়িত্বের আলো নেই। ধর তক্তা মার পেরেক যেখানে সেখানে হাজার বিদ্যুতের ঝাড় বাতিতেও বড্ডো অন্ধকার থাকে। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এই গা ঢিলেমি প্রশাসনিক ব্যবস্থার কঙ্কালসার দিক আরও চেনা হয়ে গেল। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পুষ্টিগুণাবলীতে চূড়ান্ত তাচ্ছিল্যর পর যখন প্রকৃত অবস্থানের অনুসন্ধান করছি তখন বুঝলাম টিকটিকির উপস্থিতি একটা ঘটনা এবং গাফিলতির চূড়ান্ত, যা আজ প্রতীকীও।

> **যেদিন বাঙ্গালিরা মিড ডে মিলের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল সেদিন চার আনা লাগলেও আজকে এতোটাই গাফিলতি যে ষোলো আনাই স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমঝোতা।**

কিন্তু এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রশাসনিক লোক দেখানো টিকটিকিগিরির পর একটা রিপোর্ট এবং কিছু ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের শোকজ, বড়োজোর সাসপেন্ড করলেই আমাদের রাজ্যের মিড ডে মিলের প্রকৃত সমস্যা বোঝা, জানা এবং সমাধান করা যাবে না। দলে দলে অনেক ছেলেপুলে একটু পড়াশোনা আর একটু পুষ্টির খোঁজে স্কুলে আসছে। স্কুল এনরোলমেন্ট নিঃসন্দেহে বহুল বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মান? ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৫ গত নভেম্বরে যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা ঠাকুর ঘরে টিকটিকি দেখার মতোই অলক্ষুণে। যে তথ্য বলছে— উচ্চতার সাপেক্ষে ওজনের নিম্নগামী অনুপাত কলকাতাতেই ১১.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (৫ বছরের শিশু)। যা দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলী, জলপাইগুলি, নদীয়া, বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর দিনাজপুরে যথাক্রমে ৫.৭, ৯.৩, ৬.৭, ১.৫, ০.৬, ৬.৯, ২.৫, ১.১ এবং ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সার্ভের রিপোর্ট আরও কিছু আশাহীন তথ্য প্রকাশ করেছিল। যেখানে কেন্দ্রীয় নিয়মানুসারে একজন প্রাথমিক স্কুল ছাত্রের প্রত্যহ ১০০ গ্রাম চাল, ২০ গ্রাম দানাশস্য (ডাল), ৫০ গ্রাম সবজি, ৫ গ্রাম ভোজ্য তেল পাওয়ার কথা তা বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গে মাসিক হিসেবে মিড ডে মিলে জুটছে ২ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ২৫০ গ্রাম ডাল ও চিনি। অসংখ্য স্কুলে মিড ডে মিল মানে নাকের বদলে নরুন। কখনও কেন্দ্রীয় বরাদ্দের দিকে আঙুল তোলা তো কখনও মুদ্রাস্ফীতি। একটা না একটা যুক্তিহীন আত্মপক্ষ সমর্থনের রাস্তা তৈরি রাখত রাজ্য সরকার। কিন্তু এটা যা ঘটল— সরাসরি মিড ডে মিলেই মৃত টিকটিকি! এ যেন আর মুখ দেখানোর জায়গা রাখল না। এবার কেঁচো খুঁড়তে কেউটে পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তাই এই ঘটনার সাপেক্ষে প্রশাসনিক কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার তোড়জোর থাকবেই। আই ওয়াশ চাই তো। এই নিন্দনীয় ঘটনার পর প্রশাসনিক পদক্ষেপ যদি নেওয়াও হয় তাহলে কি প্রশাসন এই উত্তর দিতে পারবে এই রাজ্যের প্রায় ২.৩২ লক্ষেরও বেশি মিড ডে মিল কর্মী কেন বেতনের, পারিশ্রমিকের মধ্যস্থতায় কাজ করছেন? উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্র শিক্ষা নিকেতনের মিড ডে মিলের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কথা। যারা সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত পরিশ্রম শেষে দৈনিক ৪০ টাকা পাচ্ছেন। যাদের নিয়োগ হয় জেলা শিক্ষা দপ্তর মারফত, যাদের শ্রমের মর্যাদাই দেওয়া হচ্ছে না। ১০ মাসের পারিশ্রমিক পান অনেক সাধ্য সাধনার পরে। অন্য রাজ্যের ছবি কেমন? অন্ধ্রপ্রদেশের স্বনির্ভর

গোষ্ঠী যেখানে মাসিক ৩০০০ টাকা, হরিয়ানা ৭০০০ টাকা, হিমাচল প্রদেশ ৩৯৫০ টাকা, পঞ্জাব ৩০০০ টাকা, কেরল ১২০০০ টাকা, তামিলনাড়ু গ্রেড ৪ কর্মীর সমতুল্য বেতন দিচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ দিচ্ছে মাসিক ১৫০০ টাকা (তাও ১০ মাস!)। কী অদ্ভুত কাণ্ড— ২০২০-র সেপ্টেম্বরে বর্ধমানে এক প্রশাসনিক বৈঠকে ঠিক হয়েছিল মিড ডে মিল কর্মীদের মহাত্ম্যা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট— ১০০ দিন কাজের আওতায় আনা হবে। কিন্তু একটাবারও এই প্রস্তাব আসেনি ওদের কর্মচারীর গুরুত্ব, সম্মান ও বেতন দেওয়া হবে। তাই একরাশ বিরক্তি নিয়ে যখন স্বনির্ভর গোষ্ঠী রান্না করছে, বাজার করছে, পরিবেশন থেকে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সবটুকু করছে, তখন তাতে স্বাভাবিক নিয়মে ক্লান্তি, অনীহা, নিরুৎসাহ দানা বাঁধে। একটা জোড়াতালি ভঙ্গিতেই কাজ করার প্রবণতা তৈরি হয়। যা নৈতিকতার দিক থেকে একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু এ এক স্বাভাবিক কর্মী চরিত্র সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

এর আগেও হুগলির চিনসুরা বালিকা বাণী মন্দির স্কুলে মিড ডে মিলে নুন ভাত দিতে দেখা গিয়েছিল। এও কি টিকটিকি পাওয়ার চাইতে কম লজ্জার! স্কুল ম্যানেজিং কমিটির তালা চাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ শাসক দলের কাছে। ফলে 'এবার মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার'— যেখানে খাতায় দেখানো হচ্ছে ৫০০০ ডিম এসেছে। কিন্তু বাস্তবে তা ফ্যান ভাত। গায়েব হয়ে যায় ২৫০ ব্যাগ চাল। হুগলী স্কুলের ঘটনাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, একটু বাড়তি লজ্জা পেলেও পেতে পারি। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরেই তো মিড ডে মিল দুর্নীতি শুরু। ২০১২-তে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এক অনুসন্ধানে অন্তত পক্ষে ৯০৯৩ কুইন্টাল চালের হদিস জানতে চান। যে অসামঞ্জস্য কলকাতা মেট্রোপলিটন কর্পোরেশনের আওতাধীন ২৪০টি প্রাথমিক স্কুলে পর্যবেক্ষিত হয়েছিল। ওই অডিট টিমের হিসাবানুযায়ী ৩৩ লক্ষ টাকার মিড ডে মিলের চাল রেজিস্টার থেকে হাওয়া। তারপর ভুজুং ভাজুং দিয়ে অঙ্ক মিলিয়ে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু মিড ডে মিল রোগ যেন মিড লাইফ ক্রাইসিসের মতোই। কিছু না কিছু সমস্যা লেগেই আছে। না আছে পুষ্টিকর খাদ্য না আছে স্বাস্থ্যকর দিক। পরিচ্ছন্নতা কেবলমাত্রই সাদা খাতাতে মেলে— মিড ডে মিল হেঁসেলে তা কোথায়! ইটাহারের সেলিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের খিচুড়িতে যখন লবণের বদলে ভুল করে গুঁড়ো সাবান দিয়ে দেয় তাও গাফিলতির ঘরে আরও একধাপ এগিয়ে যায়। এই বছরের জানুয়ারিতেই ময়ূরেশ্বরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের থালায় সাপ পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ। এর আগেও গড়বেতার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবারের গুণগত মান নিয়ে শোরগোল পড়েছিল। আরশোলা ছিল খাদ্যে। উদাসীনতা, গাফিলতি প্রতিটা গ্রাসে গ্রাসে। তাই টিকটিকির খোঁজ পেলে তা কোনো হঠাৎ ঘটনা নয়। অনেক ঘটনার পর এক টনক নড়ানো ঘটনা।

ধর্ম ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছে না পশ্চিমবঙ্গ, তাই কর্ম নৈপুণ্যে জড়ত্ব প্রাপ্তি। শৈথিল্য-ভ্রষ্ট-আবদ্ধ। নতুন বছরে ঢাক পিটিয়ে বলা হলো এবার পড়ুয়াদের পাতে পড়বে মুরগির মাংস। মরসুমি ফল। ছাত্র প্রতি সাপ্তাহিক বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে ২০ টাকা। কেন্দ্রের পোষণ প্রকল্পের হাত ধরে ৩৭১ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে আগামী চার মাসের জন্য (জানুয়ারি থেকে এপ্রিল)। কিন্তু মুরগির মাংস ঘোষণার পরেই যখন পাতে টিকটিকি পড়ে তখন তা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিকটিকির ডিমের গল্প মনে করিয়ে দেয়। 'জগতে যত রকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সবচেয়ে টিকটিকি বীভৎস। মাকড়সা, আরশোলা, শুয়োপোকা, কচ্ছপ, এমনকী ব্যাং পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু টিকটিকি!' —সত্যিই তো পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায়। শরদিন্দুবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ কিনা? প্রায় পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল টিকটিকিটার মুখে।' তার হাসিটা নিরতিশয় অবজ্ঞার হাসি।' মিড ডে মিলের টিকটিকিটাও ঠিক তেমনই বা তার চেয়েও কিছু বেশি অবজ্ঞা সূচক বার্তাবহ। সেও যেন খাবারের দৈনতা দেখে 'পঞ্চাশ হাজার' দাঁত বার করে হাসছিল। এ যেন আমাদের সার্বিক গুণগত মানের এক দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল। এই বাঙ্গালির মিড ডে মিলের এক ইতিহাস রয়েছে।

১৯২৮ সালে কেশব অ্যাকাডেমি প্রথম 'মিড ডে মিল টিফিন' শব্দ যোগে চালু করেছিল। যা ছিল বাধ্যতামূলক। তখন ছাত্র প্রতি মাসে চার আনা দিত। কোনো অভিযোগ ছিল না। চুরি ছিল না। অভাব থাকলেও তাতে দরদ যত্নের ভরপুর গন্ধ ছিল। তারপর বাঙ্গালিরা বুঝল ক্লাসরুম হাঙ্গার কী। ক্যালোরি মেপে বাঙ্গালি কোনোকালেই খেতে জানে না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে খোলাখুলি আপোশ কিছুতেই করেনি বাঙ্গালি। তাদের পাতে টিকটিকি মিড ডে মিলকে সত্যিই 'ফ্রি লাঞ্চ' করে দিল। যারা না রাখল হিসেব, না অভিযোগের গুরুত্ব। টিকটিকির আরও এক বৈশিষ্ট্য— লেজ কাটা গেলে আবার আপনা থেকেই তা গজায়। এই যে পাতে টিকটিকি এলো। এতো বড়ো গাফিলতি। যদি এক আধজন আধিকারিক বা দায়িত্বশীল মানুষকে ধমক চমক দেওয়া হয় তবে তা টিকটিকির ল্যাজ কাটার কাজ হবে। আবার গাফিলতির ল্যাজ বাড়বে। মাথা ধরার প্রক্রিয়া শুরু হোক। প্রতিটা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে স্বচ্ছতা আনা এবং বিরোধী পরিসর তৈরি একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন উপযুক্ত পর্যবেক্ষক দল এবং অডিট। যেমনটা করা হয়েছিল 'Ka Ora ka Ako'-তে— নিউজিল্যান্ডের স্কুল মিল প্রোগ্রামে। যেখানে মধ্যবর্তীকালীন মূল্যায়ন ছিল বাধ্যতামূলক। যা কেবলমাত্রই অর্থ বরাদ্দের হিসেব রাখেনি। নজর দিয়েছিল খাবার প্রস্তুত থেকে রান্না কর্মীর বেতনের। নিউজিল্যান্ডেও প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন শিশুর পুষ্টি সঙ্কট ছিল। যা ওই প্রোগ্রামে ঘুচে যায়। মিড ডে মিলের জনক হয়েও আজ বাঙ্গালিকে কেন অন্য কোথাও থেকে এর উদাহরণ আনতে হচ্ছে! সেদিন, যেদিন বাঙ্গালিরা মিড ডে মিলের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল সেদিন চার আনা লাগলেও আজকে এতোটাই গাফিলতি যে ষোলো আনাই স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমঝোতা। বাঙ্গালির অন্ধকার হেঁসেলের গল্প বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন। রান্নায় আরশোলা পড়ে গিয়েছিল, বিদ্যাসাগর তা মুখ বুজে খেয়েছিলেন। অভাবের সংসারে এক কড়াই তরকারি কেমন করে ফেলবেন! চীনারা তো আখছার খায়। কিন্তু টিকটিকি কেউ পোষেও না খায়ও না। তাই বিদ্যাসাগরের উদাহরণ দিলেও রাজ্য সরকারের রেহাই নেই। এ গাফিলতির উত্তর টিফিনের ঘণ্টা পড়ার আগেই পেতে হবে। কারণ পরের ক্লাসে তার হিসেব হবে। □

বঙ্গবাসীকে অমর্ত্য সেনের মজাদার চকোলেট বিতরণ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি অমর্ত্য সেন বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। অধ্যাপক সেন অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। তাঁর প্রতিভা বিশ্বসভায় স্বীকৃত। তার জন্য ভারতবাসী গর্বিত। কিন্তু এমন কী ঘটনা ঘটল যে হঠাৎ তিনি অর্থনীতি বাদ দিয়ে রাজনীতি নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন, তা বোঝা গেল না। রাজনীতির বিষয়টি তো তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।

অমর্ত্য সেন কয়েকদিন আগে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে মমতার। তাঁর এই মন্তব্যের পর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অমর্ত্য সেনের বক্তব্যের পরের দিনই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, ভারতে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য ভ্যাকেন্সি নেই। তিনি আরও বলেছেন, 'ভারতবাসী পরপর দু'বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ওপর ভরসা রেখেছেন। ২০২৪ সালেও মোদীজীকে দেশ যে দায়িত্ব দেবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ভারতের মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী করার জন্য তৈরি রয়েছেন। যে পদ খালি নেই সে ব্যাপারে কারও মন্তব্য নিয়ে কিছু বলার নেই।'

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'অমর্ত্য সেন যদি এই স্বপ্ন দেখেন তাঁকে বলব, আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করুন।' তাঁর আরও সংযোজন, 'নিজের নিজের রাস্তা সাফ করছেন সবাই। প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে সিট লাগে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে টাকার থলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে একজনকেও জেতাতে পারলেন না। অমর্ত্য সেনদের পুরোনো টার্গেট— নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে অন্য কাউকে বসানো। দিদিকে নিয়ে সেই দিবাস্বপ্নটা দেখছেন তিনি।'

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষ করে বলেছেন, 'এবার প্রতীচীর দরজাতেও পদ্মফুল ফুটবে।' অমর্ত্য সেনের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ দুর্গাপুরে এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বলেছেন, 'অমর্ত্য সেন বিদেশে থাকেন। বিদেশ ছাড়া কিছু ভাবতে পারেননি। পুঁথিগত অর্থনীতিবিদ, গ্রামবাংলার মানুষের কথা জানেন না। বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল নেই।'

সে যাই হোক, বরাবরই বিজেপির তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত অমর্ত্য সেন। বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের লাগাতার বিরোধিতা করে গেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের উপদেশ আমাদের কাছে আদেশ।' তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সুখেন্দুশেখর রায় বলেছেন, 'বিজেপি-বিরোধী মুখ হিসেবে দেশবাসীর কাছে বারবার নিজের যোগ্যতার প্রমাণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'অমর্ত্য সেন বাইরে থেকে দেখে মন্তব্য করেছেন। বিজেপিকে হারাতে হলে সব বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবে বিরোধী ঐক্য

রাজ্যে বর্তমানে অঘোষিত জরুরি অবস্থার জন্য এবং নেতা-মন্ত্রীদের চুরি-জোচ্চুরি, লুটের জন্য জনগণ বিষণ্ণ মনে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে অমর্ত্যবাবু যদি মাঝে মাঝে রাজ্যে এসে রাজ্যবাসীকে ওইরকম মজাদার চকোলেট বিতরণ করে আনন্দ দেন তাহলে আমরা সকলে খুশিই হবো।

নয়, তিনি বিরোধী জোট ভাঙতে নরেন্দ্র মোদীর প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছেন।'

কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেখেন। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়া কেউ সমস্ত বিরোধী শক্তিকে এক জায়গায় আনতে পারবে না।'

ইতিপূর্বে একটা প্রতিবেদনে জানা গেছে, অমর্ত্য সেনের বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর তীব্র বিরোধিতার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো, অমর্ত্য সেন ২০০৭ সালে নালন্দা মেন্টর গ্রুপের চেয়ারম্যান হন। ২০১২ সালে বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। উপাচার্য হিসেবে তিনি প্রতি মাসে ৫ লক্ষ টাকা মাইনে, অন্যান্য করমুক্ত সুযোগ সুবিধা, অসংখ্যকবার বিদেশ ভ্রমণ, বিলাসবহুল দেশি-বিদেশি হোটেলে থাকা এবং ইচ্ছেমতো চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা ভোগ করতেন।

আর এক অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিংহের শাসনকালে অমর্ত্যবাবু অধিকাংশ সময় বিদেশে বসেই নালন্দার উপাচার্য গিরি করতেন। তিনি মোট সাতজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার নিযুক্ত করেন। আর গোটা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পাঁচতারা হোটেলে পরিণত করে তুলেছিলেন।

তাঁর এই বাবদ খরচ খরচার হিসেব মাত্র ২৭২৯ কোটি টাকা। সেনবাবুর দেওয়া চাকরির ফ্যাকাল্টি হলেন— ড. গোপা সাবরওয়াল, ড. অঞ্জনা শর্মা, নয়নজ্যোতি লাহিড়ী ও উপিন্দর সিংহ। উপিন্দর সিংহ মনমোহন সিংহের বড়ো কন্যা আর অন্য তিনজন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমর্ত্যবাবু আরও তিনজন ভিজিটর নিয়োগ করেছিলেন। দামন সিংহ ও অমৃতা সিংহ মনমোহন সিংহের মেজো ও কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁরা পুরো সময়টা আমেরিকা থেকেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিউটি করতেন। ফাকাল্টি ব্যাপার আর কী!

অমর্ত্যবাবুর আরও একটা পরিচয় আছে। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনকুবের রকফেলারের কন্যা তথা নিজের ছাত্রী এমা রথসচাইল্ডকে বিয়ে করে সেই ধনকুবেরের জামাই হয়েছেন। অবশ্য তার আগে তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী নবনীতা দেবসেনকে তালাক দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন ৮১ বছর বয়সে ২০১৯ সালের ৭ নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এইসব ধাষ্টামির উপরে পূর্ণ বিরাম ও যবনিকাপতন এবং অমর্ত্য সেনের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায়। সেই থেকে সেনবাবুর বিষনজরে মোদী এবং তাঁর শাসনপ্রণালী। বিশ্বের আর কোনো অর্থনীতিবিদ অবশ্য সেনবাবুর অকথা-কুকথাকে পাত্তা দেন না।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যখনই দেশে বেড়াতে আসেন তখনই মোদী বিরোধীদের চাঙ্গা করার জন্য কিছু কিছু মজাদার চকোলেট বিতরণ করে যান। দেশে নোট বাতিলের পর একবার এসে বলেছিলেন, 'নোটবাতিল করে সুফল পাওয়া যায়নি। আরবিআই গভর্নর উর্জিত প্যাটেলকে সরকারের পছন্দ হয়নি। তাই তাঁকে সরে যেতে হয়েছে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'এটা তো ঠিকই দেশে অসহিষ্ণুতা আগের তুলনায় বেড়েছে। এর পেছনে সামাজিক কারণ যতটা আছে, তার থেকে অনেক বেশি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। দেশে নিশ্চয়ই অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। অঘোষিত বটেই এবং এটা ঘোষিত নয় মানতে হবে।'

অমর্ত্যবাবুর সেই দাবিকে নস্যাৎ করে সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছে— প্রধানমন্ত্রীর নোটবন্দির সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। ইতিপূর্বে অমর্ত্যবাবু বিদেশ থেকে রাজ্যে এসেই অনুভব করেছিলেন, দেশে অসহিষ্ণুতা বেড়েছে এবং অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। অথচ ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূলের পোষিত সন্ত্রাসী বাহিনী যখন বিরোধী তথা বিজেপি সমর্থক হিন্দুদের গৃহদাহ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহছাড়া এমনকী রাজ্যছাড়া করেছিল, তখন বিশ্বের বহু দেশে তৃণমূলের নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ভোটের ফল প্রকাশের পর বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অপরাধে ৪০ জনকে হত্যাও করা হয়েছে। যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আর কোনো রাজ্যে হয় না। সে খবর কি অমর্ত্যবাবু জানতেন না নাকি বেছে বেছে বিজেপির হিন্দু সমর্থকদের হত্যার জন্য তিনি খুশি হয়ে এই ঘটনাগুলোর কথা বলেন না? এখনও এ রাজ্যে বিরোধীরা যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পুলিশ এবং তৃণমূলের পোষিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। এ ঘটনাগুলো কি রাজ্যে অঘোষিত জরুরি অবস্থার মধ্যে পড়ে না? সেন মশাই কী মনে করেন?

নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলছেন, কী এমন ঘটনা ঘটল যে হঠাৎ অমর্ত্য সেন মমতা বন্দনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন? তবে কি বিশ্বভারতীর জমি প্রতীচীর দখল সংক্রান্ত মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চান? না অন্য কিছু?

যাইহোক, নব্বই বছর অতিক্রান্ত বয়সের অমর্ত্যবাবুর একচোখা মনোভাব ও বক্তব্যকে বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী এখন আর গ্রাহ্যই করেন না। আর আগামী ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে বঙ্গবাসী-সহ ভারতবাসী আরও বেশি সজাগ হয়ে ভোট দেবেন। কেননা রাজ্যের ভোটে জেতার পর যিনি রাজ্যের হিন্দুদের সর্বনাশা করেছেন তিনি যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে সমগ্র ভারতের হিন্দুদের কী পরিণতি করে ছাড়বেন সেটা ভেবে তাঁরা আগাম ঠিক করে রেখেছেন, কাকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসাবেন।

রাজ্যে বর্তমানে অঘোষিত জরুরি অবস্থার জন্য এবং নেতা-মন্ত্রীদের চুরি-জোচ্চুরি, লুটের জন্য জনগণ বিষণ্ণ মনে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে অমর্ত্যবাবু যদি মাঝে মাঝে রাজ্যে এসে রাজ্যবাসীকে ওইরকম মজাদার চকোলেট বিতরণ করে আনন্দ দেন তাহলে আমরা সকলে খুশিই হবো। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মোদীর আত্মনির্ভর প্রকল্প দেশকে শক্তিশালী করবে

আনন্দ মোহন দাস

কথায় আছে জোর যার মুল্লুক তার। সকলে শক্তের ভক্ত, দুর্বলের নয়। সুতরাং কোনো দেশকে শক্তিশালী ও উন্নত হতে গেলে তার সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী রাখা খুবই প্রয়োজন নতুবা দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত থাকবে না। একথা সত্য যে দুর্বল দেশ সবসময় বহিঃশত্রু আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে। সেজন্য শক্তিধর দেশগুলি সামরিক দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। সেই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর প্রকল্প প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতকে শক্তিশালী হতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে অনুমান। সেই লক্ষ্যে বর্তমান আর্থিক বর্ষে (২০২২-২৩) বাজেটে মোদী সরকার প্রতিরক্ষা বাজেটের ৬৮ শতাংশ টাকা দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ করেছেন। সেই অনুসারে পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় তার সুফল ফলতে আরম্ভ করেছে। ভারত যে এই ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হবার পথে চলেছে তা জোর দিয়ে বলা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে সাধারণত আমরা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর কাছ থেকে আমদানি করেছি। এই ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র বিদেশি শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলাম। তার ফলে সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশি ছিল। বেসরকারি ভাবে দালালি দেওয়ার জন্যও বিপুল ব্যয়ের অভিযোগ আমরা শুনেছি।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বহু চর্চিত বোফর্স কামান ঘোটালা। আমরা সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আমদানিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকি। স্বাভাবিকভাবে সরকার উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ কাটছাট করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বর্তমানে তার চিত্র বদলাতে আরম্ভ করেছে। ভারত এখন এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আমদানির ওপর নির্ভরশীল নয় বরং ভারত এখন প্রতিরক্ষা পণ্য রপ্তানি করছে। আমদানির পরিবর্তে ভারত ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রেকর্ড পরিমাণ ১৩০০০ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করেছে এবং চলতি আর্থিক বছরে তা ১৮০০০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিমাণ ৩৫০০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। বর্তমান রপ্তানির পরিমাণ আগামী লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং প্রতিরক্ষা শিল্পে আমরা যত স্বনির্ভর হব, ততই এই ক্ষেত্রে আমাদের রোজগার ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। সূত্র মারফত জানা যায়, গত পাঁচ বছরে এই শিল্পে প্রায় ৩৩৪ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যা সর্বকালীন রেকর্ড। ২০১৪ সালের পর প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫০টি দেশীয় কোম্পানি প্রতিরক্ষা শিল্পে উৎপদন করে চলেছে যা নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প 'Make in India'র অন্তর্ভুক্ত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এবং স্বাবলম্বী হওয়া যে কোনো দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক।

> অগ্নি-৫ এবং সাম্প্রতিককালে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নৌবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ আইএনএস মোরমুগাও। দুটিই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপের অন্যতম ফসল।

ভারতবর্ষ প্রতিরক্ষা বা সামরিক শক্তি হিসেবে বিশ্বে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে। প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা, দ্বিতীয় স্থানে রাশিয়া এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে চীন। পার্শ্ববর্তী শত্রু মনোভাবাপন্ন দেশের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে এবং নিজেকে শক্তিশালী করতে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম উদাহরণ হলো পারমাণবিক মিসাইল অগ্নি-৫ এবং সাম্প্রতিককালে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নৌবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ আইএনএস মোরমুগাও। দুটিই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপের অন্যতম ফসল।

পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি ৫-এর আলোচনার প্রারম্ভে বিজ্ঞানী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালামের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। তিনি ছিলেন ভারতে মিসাইল তৈরির জনক। সেজন্য তিনি

মিসাইল ম্যান হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনিই সর্বপ্রথম ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে IGMDP (Integrated guided development program) প্রকল্পের জন্ম দিয়ে দেশের মধ্যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন এবং তার রূপায়ণে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। প্রকল্পটির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেশীয় পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে আঘাত হানতে সক্ষম পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে থাকেন।

১৯৮৯ সালে প্রথম অগ্নি ১-এর সূচনা হয় এবং এই মিসাইলটি ৭০০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরের টার্গেট আঘাত হানতে সক্ষম। পরবর্তীকালে নিম্নলিখিত আরও চারটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলক ভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

(১) অগ্নি-২ : ২০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরের টার্গেট আঘাত হানতে পারে।

(২) অগ্নি-৩ : ২৫০০ কিলোমিটারের বেশি দূরের টার্গেট আঘাত হানতে পারে।

(৩) অগ্নি-৪ : ৩৫০০ কিলোমিটারের বেশি দূরের টার্গেট আঘাত হানতে পারে।

সাম্প্রাতিককালে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মিসাইল অগ্নি-৫ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এই পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ভারতের সামরিক শক্তিকে অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে। এটি DRDO দ্বারা নির্মিত ও উন্নত দেশীয় পদ্ধিতিতে তৈরি ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে লক্ষ্য বস্তুকে নির্ভুল ভাবে আঘাত হানতে সক্ষম একটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র। এই মিসাইলটি ৭০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরের টার্গেট আঘাত হানতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন মিসাইলটি প্রকৃতপক্ষে আন্তঃমহাদেশীয় (inter continental) ক্ষেপণাস্ত্র। একমাত্র অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া অগ্নি ৫-কে প্রতিহত করা সম্ভব নয় বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এই মিসাইলটির আওতায় প্রায় সমস্ত এশিয়ান দেশ, চীনের বেশিরভাগ অংশ, এমনকী চীনের রাজধানী বেইজিংও এর আওতায় এসে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ভারতের সুরক্ষার জন্য কমপক্ষে ৫০০০ কিলোমিটার পরিসরের বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র আত্মরক্ষার জন্য খুবই জরুরি ছিল। সুতরাং ৭০০০ কিলোমিটার অধিক রেঞ্জের এই মিসাইলটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে। উল্লেখ্য, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রেঞ্জের পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্রটি (মিসাইল) চীনের কাছে রয়েছে যা ১৩০০০ কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে আঘাত হানতে পারে। আর পাকিস্তানের মিসাইলটি মাত্র ২৭৫০ কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে।

সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য সাম্প্রতিককালে নৌবাহিনীর জন্য অন্যতম সংযোজন হলো আইএনএস মোরমুগাও। দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের এটি একটি অভূতপূর্ব সাফল্য এবং দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি যুদ্ধজাহাজের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই যুদ্ধজাহাজটি নৌবাহিনীর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অসাধারণ আবিষ্কার। এটি জলের ওপর ৩০ নটিক্যাল মাইলের বেশি গতিতে চলতে পারে। জাহাজটি সাবমেরিন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। জাহাজটির ৩০০ জন নাবিককে বহন করার ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত উন্নত মানের মিসাইল বহনকারী যুদ্ধজাহাজ। মধ্যম রেঞ্জের ভূতল থেকে আকাশে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত মিসাইল, ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠ ব্রাহ্মোস মিসাইল, সাবমেরিন বিরোধী দেশীয় টর্পেডো টিউব লঞ্চার, অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী জাহাজ যার উপর থেকে সফলভাবে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা যায়। অর্থাৎ নৌবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন মিসাইল বহনকারী একটি উন্নত মানের যুদ্ধজাহাজ। এটি দেশের ও বিদেশের বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির জন্য প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। এর ফলে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আয়, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি ভারতে তৈরি উন্নতমানের যুদ্ধজাহাজটি আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী ও মজবুত করবে এবং বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে রক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। □

হিন্দু ও হিন্দু ধর্মের অপমান বন্ধ হওয়া প্রয়োজন

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

গত ১১ জানুয়ারি নবগঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী আরজেডি নেতা চন্দ্রশেখর সিংহ তাঁর ভাষণে বলেছেন— তুলসীদাসের লেখা রামচরিত মানস সমাজে ঘৃণা ও হিংসা ছড়ায়, এই পুস্তক ঘৃণ্য পুস্তক। মনুস্মৃতি, রামচরিত মানস ও আরএসএস-এর দ্বিতীয় প্রধান গোলওয়ালকরের 'Bunch of thought'— এই তিনটি বই সমাজকে প্রতিনিয়ত বিভক্ত করে চলেছে। তাই এই পুস্তকগুলি বর্জন করা উচিত। এ কোনো সাধারণ ব্যক্তির বক্তব্য নয়। এই ভারতেরই এক অঙ্গরাজ্যের এক শিক্ষামন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ অর্থাৎ সরকারি বক্তব্য। এই দেশের কোটি কোটি মানুষের আস্থার গ্রন্থ রামচরিত মানস। তুলসীদাস এই গ্রন্থ লিখেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের অনন্য সুন্দর চরিত্র বর্ণনা করার জন্য। যে রামচন্দ্রের জীবন ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম, করুণা, ন্যায়, সত্য, কর্তব্যপরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত, যিনি বনবাসকালে জনজাতি নারী শবরীর এঁটো কুল সানন্দে ভক্ষণ করেছিলেন, যিনি জনজাতি নেতা গুহক চণ্ডালকে বুকে জড়িয়ে আপন করে নিয়েছিলেন, যিনি বনবাসী-গিরিবাসী তথাকথিত অসভ্য বানরকুলকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন তিনি কিনা দলিত বিরোধী? আর তার চরিত্র চিত্রনকারী গ্রন্থ রামচরিত মানস ঘৃণ্য পুস্তক?

ক'দিন আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমাদের ভয়ের কারণ কেবল বিদেশি শত্রুরা নয়। এদেশের জলে-ফুলে-ফলে লালিত কিছু হিন্দু বিরোধী বিভেদকামী মানুষ এদেশের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক। হিন্দু-হিন্দুত্ব- হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে হিন্দু সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে'— তাঁর সেই বক্তব্যকে সত্য প্রমাণিত করল বিহারের শিক্ষামন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিংহের অশিক্ষিত ভাষণ।

মোহনরাও ভাগবতের এই আশঙ্কা যে সঠিক তার প্রমাণ আমরা কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করেছি। এদেশের সংখ্যাগুরু সমাজ হিন্দু ও হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে আজ এক এমন ঘৃণার উদ্রেক করেছে যে এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিকে গালাগালি বলে মনে করেন, রামনাম শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সমাজবাদী পার্টির মুসলমান নেতা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলেন ৫০ বা ১০০ বছর পর অযোধ্যায় তৈরি হওয়া রামমন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে পুনরায় বাবরি মসজিদ তৈরি করা হবে, অর্থাৎ এদেশ অনতিবিলম্বেই ইসলামি দেশে রূপান্তরিত হবে। আরজেডি নেতা জগদানন্দ সিংহ বলেছেন— ঘৃণার মাটিতে তৈরি হচ্ছে রামমন্দির। আপ নেতা রাজেন্দ্র পাল গৌতম দলিতদের বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরকরণের এক অনুষ্ঠানে তাদের হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন কিছুদিন আগে। ভীম আর্মি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রশেখর আজাদ স্লোগান তুলেছেন জনজাতি দলিতেরা হিন্দু নয় তাই তার স্লোগান 'জয় ভীম জয় মিম' এই মিম মানে AIMIM। অর্থাৎ আসাদুদ্দিন ওয়েইসির চরম সাম্প্রদায়িক ইসলামি সংগঠনের সঙ্গেই দলিতরা জোট বাঁধুক। আর

কংগ্রেসের নেতারা তো হিন্দুধর্মকে গালাগালি দেওয়ার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদ বা 'Safron Terrorism' শব্দের উদ্‌গাতা এই শতাব্দী প্রাচীন দলটিই। রাহুল গান্ধী বলেন, যারা মন্দিরে যায় তারা মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে। তাদের আর এক প্রধান নেতা, লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার শিবরাজ পাটিল বলেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হিন্দুদের জিহাদের শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ গীতা হিংসার গ্রন্থ।

এই দলেরই সলমন খুরশিদ বলেন, হিন্দুত্ব আর আইসিএস ও বোকোহারাম সমার্থক। কর্ণাটকের আর এক নেতা বলেন, হিন্দু হলো 'Dirty Word', নোংরা শব্দ। শুধু এরাই নয়, এদেশের কমিউনিস্টরা তাদের জন্মলগ্ন থেকে হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র সুচারুরূপে করে চলেছে। এই সেদিন দিল্লির জেএনইউ-তে টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং-এর সদস্য ওমর খলিদ, কানহাইয়া কুমার, অনির্বাণ ভট্টাচার্যরা যে স্লোগান তুলেছিল— 'জঙ্গ রহেগী জঙ্গ রহেগী ভারত কী বরবাদি তক্' চাহিয়ে ভারত সে আজাদি, চাহিয়ে হিন্দু ধর্ম সে আজাদি'— তার ঢেউ এসে পড়েছিল ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে খ্যাত আমাদের এই কলকাতার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। কলকাতার বইমেলাতেও কমিউনিস্টরা গীতা পুড়িয়ে 'ওঁ' পতাকায় লাথি মেরে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা বুঝিয়ে দিয়েছে। এবার যোগ হলো বিহারের

অশিক্ষিত মন্ত্রীর ঘৃণাভরা ভাষণ।

যদি ভাবেন এগুলি কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা তবে জানবেন যে আপনি মস্ত বড়ো ভুল করেছেন। এসব হলো ভারতের হিন্দুসমাজকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেওয়ার এক দীর্ঘমেয়াদি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অঙ্গ। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের নিরীক্ষণ যথার্থই। এদের লক্ষ্য একধারে হিন্দুসমাজকে জাতপাতে বিভক্ত করে টুকরো টুকরো করে দেওয়া, অন্যধারে এদেশের সংগঠিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তা দেওয়া যে আমরা 'তোমাদেরই লোক'। এরা ভারতে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত জনজাতি-উপজাতি— দলিতদের সঙ্গে মুসলমানদের যুক্ত করে এই দেশ অর্থাৎ হিন্দু ভারতকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করতে চায়। তাই এই পশ্চিমবঙ্গে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে আইএসএফ নেতা আব্বাস সিদ্দিকি বলেছিলেন বাঙ্গলার দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা।

গান্ধীজী বলতেন রামচরিত মানস হলো এদেশের সাধারণ জনমানসের চরিত্র গঠনের অনুসরণীয় গ্রন্থ। এই সেদিন অযোধ্যায় রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কামেশ্বর চৌপাল নামে এক ডোম সমাজের মানুষ। তাই এদেশে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সমাজে কিছু বৈচিত্র্য থাকলেও রামচরিত মানস, গীতা— এই গ্রন্থগুলিই যুগে যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকল সম্প্রদায়ের কাছেই শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ মিলনের যোগসূত্র। কিন্তু হিন্দুধর্মের উদারতা ও সহিষ্ণুতার সুযোগে দেশবিরোধী এই শক্তিগুলি আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে কালিমালিপ্ত করার স্পর্ধা দেখাবার সাহস পাচ্ছে। এই উদারতা ধীরে ধীরে আমাদের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

হিন্দুধর্মকে অপমান করার অধিকার কোনো ব্যক্তি, কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো সরকারকে এই সমাজ দেয়নি। এই কঠোর কথাটি আজ এদের বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। আর এই বোঝাবার দায়িত্ব সমগ্র হিন্দু সমাজেরই। যে কারণে কেউ ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের ভুলেও সমালোচনা করতে সাহস করে না— আমাদেরও এমন কঠোর হতে হবে। সেজন্য চাই হিন্দুত্বের জাগরণ। যে জাগরণে শেয়াল-শকুনের মতো দলগুলির হিন্দুসমাজকে জাতি-পন্থ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাওয়ার অভিলাষ চিরদিনের মতো বিনষ্ট হয়। তবে ধর্ম বাঁচবে, দেশ বাঁচবে। বোধ করি সে সময় আসন্ন। □

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতির বেঙ্গল প্যাক্টের শতবর্ষ অতিক্রম

গত ৮ জানুয়ারি একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতির বেঙ্গল প্যাক্ট শতবর্ষ পেরোল' নিবন্ধটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হতো। পরে মতবিরোধের কারণে কয়েকজন সমমনস্ক নেতাকে নিয়ে তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত সংগ্রাম ছাড়া বাঙ্গলার স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি মুসলমানদের সঙ্গত অধিকারের প্রতি সহানুভূতি দেখানো অপরিহার্য মনে করেন। তাই তাঁর স্বরাজ্য দলকে শক্তিশালী করতে তিনি ইসলামিদের সহযোগিতা কামনা করেন। এই প্রসঙ্গে আমার বিশ্বাস তিনি অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন দাস কুরআন শারিফ পুস্তকটি পড়া তো দূরের কথা, সম্ভবত চোখেও দেখেননি যে তাতে মুসলমানদের প্রতি কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দননগর।

নোট বাতিলেই সম্মতি শীর্ষ আদালতের

গত ২ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত রায় দিল ২০১৬ সালে মোদী সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক নয়। কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরমের আনীত অভিযোগ ৪-১ সদস্যের রায়ে খারিজ হয়ে গেল। শীর্ষ আদালতে বিচারপতি এসএ নাজিরের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল। বিচারপতি নাজির অবসর নিচ্ছেন ৪ জানুয়ারি। আদালতের নিয়মানুসারে যে বিচারপতির নেতৃত্বে শুনানি চলে তাঁর অবসরের আগে শুনানি চলা আবেদনের নিষ্পত্তি করতে হয়। সেই নিয়ম মেনে গত ২ তারিখের এই রায়।

প্রথমে বলতে হয়, এই রায় কার্যত বিরোধী বিশেষত কংগ্রেসের মুখে ঝামা ঘষে দিল। এই বিষয়ে সবচেয়ে সরব ছিলেন রাহুল গান্ধী। দ্বিতীয়ত, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালত কোনো রায় দিতে পারে না। গণতন্ত্রে চার সাংবিধানিক স্তম্ভের পৃথক বর্ণিত কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। সেখানে কেউ কারুর সীমা লঙ্ঘন করবে না। তাই আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি সঙ্গত কারণেই। তৃতীয়ত, এই নোট বাতিল হয়েছে আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগে। তাই এই বিরোধী আবেদনের সারবস্তু কিছু নেই। কারণ এই নোট বাতিলের ফলে সাধারণ মানুষের যে অসুবিধা হয়েছে আজ সমাজে তার কোনো প্রতিফলন নেই। আর যে নোট বাতিল হয়েছিল তা আর অর্থ ব্যবস্থায় ফিরিয়ে এনে জনসাধারণের দুর্দশা মোচনের ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা বাতুলতার মতো চিন্তা। এই কথাটি বলা হয়েছে আদালতের রায়ে। চতুর্থত, যেহেতু বিষয়টি আর্থিক সম্পর্কিত তাই এই বিষয়ে রায় দেবার পারদর্শিতা বিচারপতিদের নেই। সরকার যদি আগাম ঘোষণা করে নোট বাতিল করত তাহলে না হয় আদালত এই বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে পারত। এক্ষেত্রে কোনো দেশ নোট বাতিল করে জনসাধারণকে না জানিয়ে। কাজেই এ বিষয়ে শীর্ষ আদালতের কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং সঙ্গত কারণেই শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত যথাযথ এবং সঠিক।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

সারা পৃথিবীর হিন্দুরা ভারতকে ভালোবাসে

হিন্দুরা ভারতকে ভালোবাসে। শুধু বাংলাদেশের হিন্দু নয়, পুরো বিশ্বের হিন্দুই ভারতকে ভালোবাসে। এমনিতে ভারতকে 'অপছন্দ' করার কোনো কারণ নেই। ভারত গণতান্ত্রিক দেশ, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। ভারতীয় সভ্যতা হাজার হাজার বছরের পুরানো। পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নির্যাতিত সকল ধর্ম-বর্ণ-জাতির মানুষের আশ্রয় মেলে। আফগানিস্তানের নির্যাতিত মুসলমান, ইরানের নির্যাতিত বাহাই ইরাকের ইয়াজদি বা বাংলাদেশ/পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দু সবাই। এমনকী বিএনপি-আওয়ামী নেতাও। শুধু বাংলাদেশ নয়, হিন্দু মাত্রই ভারতকে ভালোবাসে। বৌদ্ধরাও ভালোবাসে। সাউথ আমেরিকায় প্রচুর হিন্দুর বসবাস। তাঁরা ভারতকে ভালোবাসে। হিন্দি গান, ভারতীয় মুভি তাঁদের দৈনন্দিন চর্চা। বলা যায়, আমাদের চেয়ে তাঁরা ভারতকে বেশি পছন্দ করে। তাঁদের অনেকের জীবনের লক্ষ্য থাকে জীবনে একবার ভারত যাওয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটারদের অনেকের হিন্দু নাম তা সবার জানা। ত্রিনিদাদ, গায়েনা ও এতদাঞ্চলের অন্যান্য দেশের হিন্দুরা বা এমনকী আয়ারল্যান্ড, টোবাগো, জীবতি বা বালি'র হিন্দুরাও ভারতকে ভালোবাসে।

ভারত ভাগের পর দুই পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নেয়। এখনো প্রতিনিয়ত নিচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত প্রায় এক কোটি হিন্দু শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল। নির্যাতিত মুসলমানদেরও আশ্রয় দিয়েছিল। তবে ভারতকে ভালোবাসা আর ভারতে চলে যাওয়া এক নয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতে স্বেচ্ছায় যায় না, যেতে বাধ্য হয়। ভারত হিন্দুর পুণ্যভূমি। তাই, বিশ্বের হিন্দুরা ভারতকে ভালোবাসলে দোষের কিছু নেই।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

ফঃ ৩

বন্দে সুরভী ধেনুমাতরম্

উরুগুয়ে একটি ছোটো দেশ হলেও যা সারা বিশ্বে জৈবিক কৃষির দিক থেকে এক নম্বরে স্থান করে নিয়েছে। সে দেশে মানুষ প্রতি ৪টি গোরু আছে। মাত্র ৩৩ লক্ষ লোকের দেশে গোরু আছে ১ কোটি ২০ লক্ষ। প্রতিটি গোরুর কানে লাগানো আছে ইলেকট্রনিক চিপ। কোন গোরু কোথায় আছে— তা তারা দেখতে পায় এবং একজন কৃষক মেশিনের ভিতর বসে ফসল কাটছে তারপর আরেকজন স্ক্রিনে কাউন্ট করছে, ফসলের ডাটা সংগ্রহ করছে। সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে কৃষক নিজের প্রতিবর্গ মিটারে ফলন বিশ্লেষণ করে। ২০০৫ সালে ৩৩ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ, ৯০ লক্ষ মানুষের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছিল এবং আজ অবধি ২ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছে। উরুগুয়ের সফল পারফরম্যান্সের সঙ্গে দেশটির কয়েক দশকের গবেষণায় কৃষি ও পশুপালন জড়িত। পুরো কৃষিকাজ দেখার জন্য ৫০০ জন কৃষি বৈজ্ঞানিক মোতায়েন করা হয়েছে। সমস্ত শস্য, দুধ, ঘি, মাখন সহজে রপ্তানি হয় এবং প্রতিটি কৃষক বার্ষিক ১ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার আয় করে।

এ দেশের জাতীয় প্রতীক সূর্য। জাতীয় প্রগতির প্রতীক গোরু, ঘোড়া। উরুগুয়েতে একটি গোরু হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন রয়েছে। ধন্যবাদ এই গোরুপ্রেমী দেশকে। এই সমস্ত গোধন ভারতীয় প্রজাতির। সেখানে সমস্ত গোরু 'ভারতীয় গোরু' নামে পরিচিত। এটা দুঃখজনক যে ভারতে গোরু জবাই করা হয় এবং উরুগুয়েতে গোরু জবাইয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। আমরা কী জৈবিক কৃষি দেশ উরুগুয়ে থেকে কিছু শিখতে পারি না?

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

With Best
Compliments from -

A
Well Wisher

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতার ফলশ্রুতি

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের সুখ্যাতি যে অত্যুক্তি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রমাণ হিসেবে বাস্তব চিত্র বর্তমান। বিশ্বে দু-একটি দেশ ছাড়া সকলদেশই গণতন্ত্রকেই বেছে নিয়েছে। প্রশ্ন জাগে, রাজতন্ত্র পরাভূত হওয়ার কারণ কী? উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখবো শিক্ষার প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মানবিক দিকগুলো বিকশিত হতে থাকে এবং মানুষের চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, মানব মনের ধর্মীয় বিশ্বাস দর্শন শাস্ত্রের পরিমার্জিত জ্ঞান-প্রজ্ঞার দ্বারা সংস্কার সাধন ঘটতে থাকে। এমনকী রাজতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ধর্মীয় ভাবে কর্মফল ভোগ, কুকর্ম অনুযায়ী যোগ্য শাস্তিধর্মের বিধান বিচার ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র মূলত আধ্যাত্মিক। দর্শন শাস্ত্রের চারটি শাখার প্রথমটি হলো জ্ঞান বিদ্যা। দ্বিতীয়টি অধিবিদ্যা, মহান দার্শনিক প্লেটোর মতে অধিবিদ্যা ও দর্শন একই যোগসূত্রে গ্রথিত। অধিবিদ্যাই মানব মনের ধর্মের সন্ধান দিয়েছে। ধর্মের বস্তুত দুটি রূপ। আভাষিক রূপ ও সত্তার রূপ। অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার।

তৃতীয় শাখা হলো তর্কবিদ্যা, ব্যবহারিক বিজ্ঞান চিন্তা ও জ্ঞানের তত্ত্ব অভিন্ন। বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ দর্শন উন্মোচন করে। চতুর্থ শাখা হলো নীতিবিদ্যা। অধিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্বসত্তার, নীতিবিদ্যার যে সংযোগ তা নির্ণয় করে। আত্মা অবিনশ্বর, তাকে মেনে নিতেই হবে, এইটাই দার্শনিক পূর্ণতার ভিত্তি। দর্শন জগৎ ও জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে। মানব সভ্যতার ন্যায়দর্শন তর্কবিদ্যার বিচার ব্যবস্থা নির্ভরশীল। বিচার ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে ন্যায়দর্শনের রূপ দিয়েছে এটাই প্রগতিশীল বিশ্বের বাস্তব চিত্র। হেগেল, কান্ট, ম্যাকেঞ্জি অধিবিদ্যা বা পরম সত্তাকে ও জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেন। ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান দুই প্রকার। ব্যবহারিক জ্ঞান ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান।

ভারতীয় শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য— সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। ড. রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় দর্শনকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ফ্রান্সের মহান ব্যক্তি রোমাঁরোলাঁ একই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে আদর্শে ব্যতিক্রমধর্মী বা গণতন্ত্র বিরোধী বহু ব্যক্তি মানব সমাজের উন্নতির পরিবর্তে আত্মসুখে উন্মুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইতালির জাতীয়তাবাদী নেতা বেনিতো মুসোলিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অ্যাভান্টি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে ফ্যাসিস্ট দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে 'ইল পোপালা ডি ইতালিয়া' পত্রিকা নিজেই সম্পাদনা করেন। বিশ্ব মানব সভ্যতার রাজনৈতিক চিন্তাধারার অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে গিয়ে প্রমাণ করেছে ধর্মীয় বিশুদ্ধতায় বিচার ব্যবস্থাই মানব সমাজ ও মানব সভ্যতাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর রাখতে পারে। জার্মান সেনাপতি অ্যাইখম্যান ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যাকারীর দেরিতে হলেও বিচারে তার ফাঁসি হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্রমওয়েল তাঁর জীবদ্দশায় জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু তার মৃত্যুর ২৮ বছর পর তার কৃতকর্মের পুনর্মূল্যায়ন করা হয় এবং তাতে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন। কবর থেকে তার কংকাল তুলে ফাঁসি দেওয়া হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থা দেশকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে পারে, এটাই একমাত্র ভরসা, একথা বলার অপেক্ষা রখে না।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও আজ আর স্বপ্ন নয়

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

আমরা সদ্য পেরিয়ে এলাম আরও একটি জাতীয় শিশু কন্যা দিবস। প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি এই দিবস পালন করা হয়। আমাদের সমাজে কন্যাদের অবহেলার বিষয়টি কারোরই অজানা নয়। এমনকী পৃথিবীর আলো দেখার আগে মাতৃগর্ভেই তাকে মেরে ফেলার প্রক্রিয়াও নতুন কিছু নয়। যে নারীকে রত্নগর্ভা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেই তাকেই গর্ভে ধারণ করার অপরাধে গর্ভধারিণীকে কখনও প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নির্বিকারে হত্যা করার ঘটনাও হামেশাই শোনা যায়।

নারীর এহেন অপমান, লাঞ্ছনার ঘটনা সংবাদপত্র, টেলিভিশন,সোশ্যাল মিডিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। তবু সময় বদলায়, দিন বদলায়। আর সেই পরিবর্তিত সময়ের হাত ধরে সমাজের রীতিনীতি নিয়মকানুন, মানুষের মানসিকতার বদল ঘটে। এই বদলের সাক্ষী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' দেশের কন্যাসন্তানদের জীবনে এনেছে একরাশ আলোর জোয়ার।

২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি হরিয়ানার পানিপথে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং শিশুকন্যাদের শিক্ষায় উৎসাহ দান করা। এই প্রকল্পের প্রভাব আজ শুধু জাতীয় পর্যায়ে শিশুর জন্মের লিঙ্গ-অনুপাতের পরিসংখ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, শিক্ষার আঙিনায়ও তার বিস্তার চোখে পড়ার মতো।

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি বেড়েছে ৮০ শতাংশ। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে লিঙ্গ অনুপাত ছিল ৯১৮, সেখানে ২০২১-২২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৩৪। এছাড়া কন্যা সন্তান দত্তক নেওয়ার বিষয়টিও ২০২২ সালের একটি বিজ্ঞপ্তির সুবাদে আগের থেকে আরও সহজ হয়ে উঠেছে।

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নীতি আয়োগ বলেছে যে এই কর্মসূচি দেশে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তাদের পঞ্চম প্রতিবেদনে বলেছে, এই প্রকল্পটি সমাজে শিশুকন্যাদের গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় সচেতনতা গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। এই মর্মে ২০২২ সালের ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক শিশুকন্যা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কিশোরীদের জন্য অপ্রচলিত জীবিকার (এনটিএল বা নন্ ট্র্যাডিশনাল লাইভলিহুড) ক্ষেত্রে একটি আন্তঃমন্ত্রক সম্মেলন আয়োজন করে। এই সম্মেলনে মেয়েদের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত-সহ বিভিন্ন পেশায় তাঁদের যোগদানের প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে এখনও মহিলাদের যোগদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

মেয়েদের দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের নাগরিক এবং প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য 'সাত দিনের পোর্টাল' চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়া যেমন সরল হয়েছে, তেমনই ভারতীয় শিশুকন্যাদের আন্তর্জাতিক দত্তক গ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে। দত্তক নেওয়া শিশুদের মধ্যে পুরুষশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুর সংখ্যাই বেশি। অন্যদিকে বিদেশে দত্তক নেওয়া ভারতীয় শিশুদের মধ্যেও শিশুকন্যারাই

সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ২০২২ সালের ১০ নভেম্বর থেকে এই পোর্টালের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এইভাবে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচির মাধ্যমে যে কন্যারত্নরা একদিন অঙ্কুরেই ঝরে পড়ত, সেই তারাই আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে মুক্ত বাতাসের ঘ্রাণ গ্রহণ করছে। তাই এই প্রকল্প শিশুকন্যাদের গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশবাসীর মানসিকতায় শুধু পরিবর্তন আনেনি, সেই সঙ্গে সম্মিলিত জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটাতেও সাহায্য করেছে।

'অঙ্গনা' বিভাগের জন্য লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। বিষয় : নারী ক্ষমতায়ন, বর্তমান ভারতে নারী সমাজের অগ্রগতি, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মাতৃশক্তি, নারী শক্তির উত্তরণের কাহিনি, রত্নগর্ভা মা ইত্যাদি নারী জাগরণের যে কোনও দিক। যা ভারতীয় নারী সমাজের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে সক্ষম।
ওয়ার্ড ফাইল অথবা পিডিএফ পাঠাতে পারেন। হাতে লেখা কপি স্ক্যান করে পাঠাবেন।
যোগাযোগ-স্বস্তিকা সম্পাদকীয় বিভাগ,
মোবাইল-৮৪২০২৪০৫৮৪

বিঃ দ্রঃ- অঙ্গনা বিভাগে শুধুমাত্র মহিলা লেখকদেরই লেখা প্রকাশিত হয়।

ল্যারিনজাইটিসে সাবধানতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অনেক সময়ে বেশি জোরে চিৎকার করলে বা অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে কথা বললে পরের দিন গলা ভাঙা ভাঙা থাকে। গলা খাঁকারি দিয়েও পরিষ্কার হয় না। আমাদের গলার স্বরযন্ত্রকে ইংরেজিতে বলে ল্যারিংক্স। এর ভিতরে থাকে দুটি ভোকাল কর্ড। আমরা যখন গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ করি বা কথা বলতে চাই তখন আমাদের মুখের কারিকুরিতে নিঃশ্বাসের বাতাস এই দুটি ভোকাল কর্ডে সঠিক কম্পন তৈরি করে। এর ফলেই আমরা কথা বলতে পারি।

ভোকাল কর্ডে কোনও ক্ষত হলে নিঃশ্বাসের বাতাস ঠিকমতো কম্পন তৈরি করতে পারে না, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ঘটে। আবার অস্বাভাবিক জোরে কথা বললে, একটানা চেঁচালে ভোকাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কখনও কখনও শ্বাসনালীর উপরিভাগে কোনও সংক্রমণ হলে বা আলার্জিক রি-অ্যাকশনে প্রদাহ হতে পারে। এমনকী দূষিত বাতাসের কারণে ভোকাল কর্ডের মাঝখানে আটকে যেতে পারে। এর ফলে গলা বসে যাওয়া, স্বর না বেরোনো বা কণ্ঠস্বরে বদল হয়। আর এর সবগুলির পিছনেই দায়ী ল্যারিংসে প্রবাহ, যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে ল্যারিনজাইটিস। কিশোর বয়সেই রোগটি বেশি হয়।

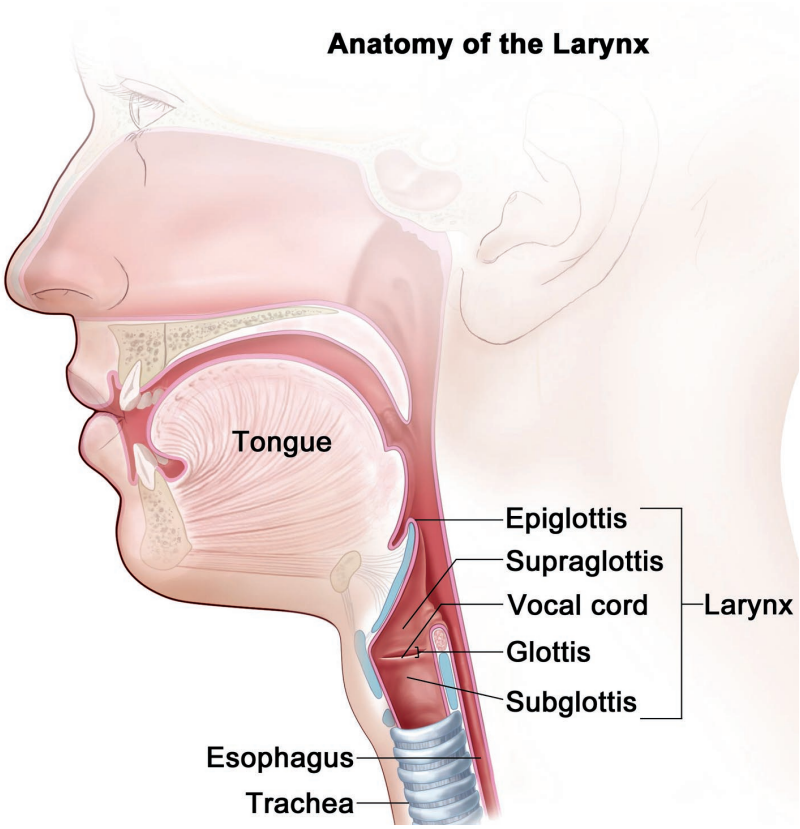

ল্যারিনজাইটিস হলে কণ্ঠস্বর তো পালটে যায়, কখনও কখনও একেবারে বন্ধও হয়ে যায়। জ্বর আসাও অস্বাভাবিক নয়। শরীরে সবসময়ে একটা ক্লান্তি অনুভূত হয়। সঙ্গে উপসর্গ হিসেবে থাকে গলাব্যথা ও কাশি।

ল্যারিনজাইটিস হলে কিছুদিন তো ভুগতে হবে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শমতো এমনভাবে চলতে হবে, যাতে তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বর ফিরে পাওয়া যায়। এর জন্য কতকগুলি টিপস মেনে চলতে হবে—

(১) ল্যারিনজাইটিসের কারণ যাই হোক না কেন গলাকে পুরোপুরি বিশ্রাম দিতে হবে। প্রথম দু-তিনদিন কোনও কথা বলা চলবে না। এমনকী ফিসফিস করেও নয়। কাউকে কিছু বলতে হলে লিখে বোঝান।

(২) চিৎকার করতে গিয়ে যদি গলা ভেঙে যায়, তাহলে জানতে হবে ভোকাল কর্ডের কোনও ক্যাপিলারি মানে সরু রক্তবাহী শিরা হয়তো-বা ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু যদি আপনি অ্যাসপিরিন খান তাহলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না, ক্ষত শিরাও শুকোয় না। কাজেই লারিনজাইটিসে অ্যাসপিরিন নিরাপদ নয়। আর ১২ বছরের কম বাচ্চাদের অ্যাসপিরিন থেকে দূরে রাখা উচিত।

(৩) দুটি ভোকাল কর্ডের মাঝখানে শ্লেষ্মা আটকে গিয়ে সমস্যা হয়। সেজন্য একটা বড়ো বাটিতে টগবগে ফুটন্ত জল নিয়ে তার উপর মিনিট পাঁচেক মাথা নিচু করে বসুন। দিনে দুবার করে তাপ নিতে পারলে শ্লেষ্মা অনেকটা শুকোবে।

(৪) এই সময়ে দিনে অন্তত আট থেকে দশ গ্লাস জল খাওয়া দরকার।

(৫) নুন দিয়ে বারবার নিয়ম করে গার্গল করলেও উপকার পাওয়া যাবে।

(৬) ঠাণ্ডা জল, কোল্ড ড্রিংক্স, ফ্রিজের ঠাণ্ডা দই মোটকথা ঠাণ্ডা কিছুই খাওয়া যাবে না এই সময়ে। সিগারেট থেকেও দূরে থাকুন। অনেক সময়ে ল্যারিনজাইটিস প্রাণসংশয়ের কারণ হতে পারে। যদি দেখেন ভাঙা গলার সঙ্গে মুখের লালা পর্যন্ত গিলতেও কষ্ট হচ্ছে, তাহলে দেরি না করে ডাক্তারের কাছে যান। কাশির সঙ্গে রক্ত পড়লে, নিঃশ্বাসের সময়ে গলায় শব্দ হলে সেইসব উপসর্গ ফেলে রাখা উচিত নয়। ল্যারিনজাইটিস যদি সারতে না চায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে ভয়ের কারণ বই কী। হতে পারে গলায় হয়তো টিউমার হয়েছে। তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে গলার স্বর স্বাভাবিক না হলে ডাক্তার অতি অবশ্যই দেখানো উচিত। ▯

মিড ডে মিলে মাছের তেলে মাছ ভাজছে রাজ্য

বিশ্বপ্রিয় দাস

এ রাজ্যের সরকার প্রায় সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পই নিজের নামে চালিয়ে দিতে সিদ্ধ হস্ত। সে সড়ক যোজনাই হোক বা আবাসন প্রকল্প। শিক্ষা ব্যবস্থাতেও তাই। খরচার টাকা আসে কেন্দ্র থেকে। ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে চালিয়ে দেবেন নিজের ব্র্যান্ডে। সমগ্র শিক্ষা মিশনের কথাই বলতে চাওয়া হচ্ছে এখানে।

সর্ব শিক্ষা অভিযান ভারত সরকারের একটি প্রধান প্রকল্প, যেটা আরম্ভ করেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। প্রধান উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করা। আমাদের দেশের সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনীতে নির্দেশ করা হয়েছে যে ৬-১৪ বছর বয়সীদের (২০০১ সালে ২০৫ মিলিয়ন আনুমানিক) বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিতে হবে। শিশুদের এই অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করেছে সংবিধান। বিধান মৌলিক অধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য ২০১০ সাল পর্যন্ত সবার জন্য ন্যূনতম শিক্ষা প্রদান। এরপর এই প্রকল্প আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নাম হয়ে যায় সর্ব শিক্ষা মিশন।

১৯৯৩ সালের উন্নিকৃষ্ণন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে 'রাইট টু এডুকেশান'-কে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ২১ নম্বর ধারায় 'রাইট টু লাইফ'-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এতে বলা হয় যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে সেই সময়ের কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা উদ্যোগী হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৯ সালে 'প্রারম্ভিক

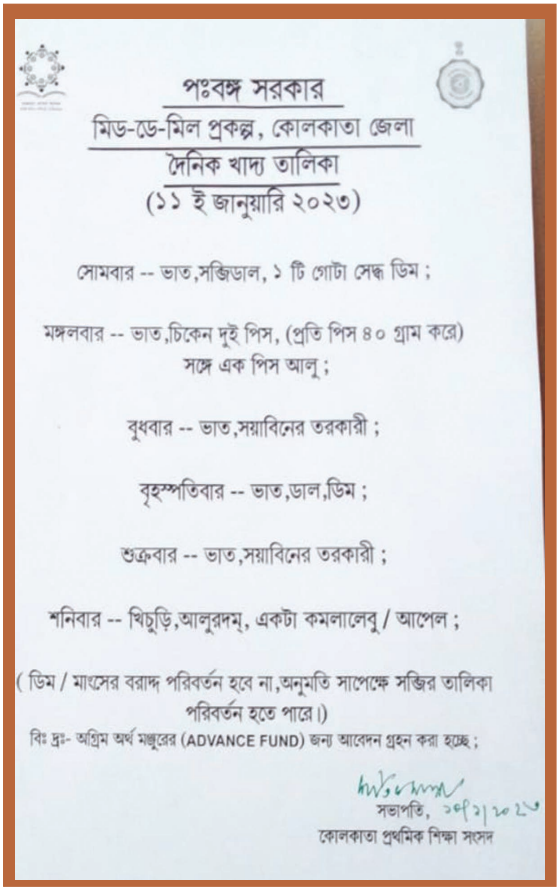

পঃবঙ্গ সরকার
মিড-ডে-মিল প্রকল্প, কোলকাতা জেলা
দৈনিক খাদ্য তালিকা
(১১ ই জানুয়ারি ২০২৩)

সোমবার -- ভাত,সব্জিডাল, ১ টি গোটা সেদ্ধ ডিম ;

মঙ্গলবার -- ভাত,চিকেন দুই পিস, (প্রতি পিস ৪০ গ্রাম করে)
সঙ্গে এক পিস আলু ;

বুধবার -- ভাত,সয়াবিনের তরকারী ;

বৃহস্পতিবার -- ভাত,ডাল,ডিম ;

শুক্রবার -- ভাত,সয়াবিনের তরকারী ;

শনিবার -- খিচুড়ি,আলুরদম্, একটা কমলালেবু / আপেল ;

(ডিম / মাংসের বরাদ্দ পরিবর্তন হবে না,অনুমতি সাপেক্ষে সব্জির তালিকা
পরিবর্তন হতে পারে।)
বিঃ দ্রঃ- অগ্রিম অর্থ মঞ্জুরের (ADVANCE FUND) জন্য আবেদন গ্রহন করা হচ্ছে ;

সভাপতি, ১০/১/২০২৩
কোলকাতা প্রথমিক শিক্ষা সংসদ

শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি 'বিশেষভাবে উদ্যোগী হয় ও সংবিধান সংশোধন করা হয়। তারই ফল হলো এই সর্বশিক্ষা অভিযান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে এনে তাদের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে ধরে রেখে নির্দিষ্ট পাঠক্রম শেষ করার মহান প্রচেষ্টাই হলো সর্বশিক্ষা অভিযান। দেশের সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়কে আনা হয় এর আওতায়। আর শিশু পুষ্টির জন্য এই প্রকল্পের হাত ধরে চালু হয় মিড ডে মিল।

১৯৯৫ সালে প্রথম চালু হয় জাতীয় পুষ্টি সহায়তা প্রকল্প, যার আজকের পরিচিত নাম মিড ডে মিল প্রকল্প। শুরু করে ভারত সরকার। আমাদের রাজ্যে প্রথমে চালু না হলেও পাকাপাকি ভাবে ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চালু হয় মিড ডে মিল। সেই সময়ে দেওয়া হতো তিন কিলো করে মাথাপিছু চাল অথবা গম প্রতি মাসে। সম্ভবত ২০০২ সালে রাজ্যে চালু হয় রান্না করা পুষ্টিকর মিড ডে মিল। কলকাতায় অবশ্য একটু পরে বৃহৎ আকারে চালু হয় ২০১০ সালে। সম্প্রতি চালু হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির মাত্রা বাড়াতে মাংস-ডিম-ফলের অতিরিক্ত বরাদ্দ। প্রতি মঙ্গলবার মাংস, প্রতি রবিবার ফল, আর একদিন ডিম। ২০০৪ সালে ৩০০ ক্যালোরি ও ১২ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যাবে এমন খাদ্যের কথা বলা হয়। ২০০৬ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫০ গ্রাম। এই পুষ্টিযুক্ত খাবার পাবে ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রশ্ন উঠছে, কে দেখবে? কে মাপবে এই মাত্রা?

সম্প্রতি দেশের প্রায় কয়েক কোটি স্কুল পড়ুয়ার জন্য যে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু আছে, সেটির নাম পরিবর্তন হয়েছে। নাম হয়েছে পিএম পোষণ প্রকল্প। গত বছর ১ অক্টোবর থেকে স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নার খরচ ৯.৬ শতাংশ বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এটি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ক্ষেত্রে বহাল থাকবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। বর্তমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত। এই স্কিমের অধীনে দেশের প্রায় ১১ লক্ষ স্কুলের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর প্রায় ১১.৮ কোটি পড়ুয়াকে মিড ডে মিল প্রদান করা হয়। এর অধীনের প্রাক-প্রাথমিক পড়ুয়াদেরও দুপুরের খাবার দেওয়া হয়।

এই প্রকল্পে আগামী পাঁচ আর্থিক বছরে কেন্দ্রের খরচ ধরা হয়েছে ৫৪ হাজার ৬১ কোটি টাকা। ৩১ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা দেবে রাজ্যগুলি। খাদ্যশস্যের জন্য অতিরিক্ত ৪৫ হাজার কোটি বরাদ্দ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। সবমিলিয়ে প্রকল্পের খরচ ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকার মিড ডে মিল নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ সরব। তাঁরা কেন্দ্রীয় অনুদানের কথা না বলে নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটাতে থাকেন। আর দুর্নীতি থেকে নিম্ন মানের খাবার সরবরাহের খবর আসতে থাকে সমানে। তা পড়ে থাকে পিছনে, রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীর আবার গোসা হয়েছে, মিড ডে মিল প্রকল্পের নাম পরিবর্তনে। তার আপত্তির কারণ, নামে 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি আছে বলে। অনেকে বলছেন রাজ্যের মাননীয়ার অনুপ্রেরণা লিখলে হয়তো ভালো হতো।

সম্প্রতি ১১ জানুয়ারি দুটি মেনু তালিকা সামনে আসে। তাতেই সংশোধিত তালিকা দেখে বেশ খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েন সবাই। সেখানে দেখা যায় বৃহস্পতিবারের তালিকায় একটিতে ডিম আছে অন্যটিতে নেই। যদিও সবশেষে এই মেনু চার্টের পরিবর্তন হতে পারে শব্দটি যত্ন সহকারে লেখা আছে। রবিবারে ফল দেওয়ার কথা বলা আছে। প্রথম সপ্তাহে দেখা যায়, অনেক জায়গাতেই আপেল দেওয়া হয়েছে একটি করে। এত নিম্নমানের আর ছোটো সেই আপেল যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। এদিকে যে বরাদ্দ রাজ্য সরকার করেছে সেটি নিয়েও একদিকে যেমন পিছনে মুখ খুলেছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী-সহ যারা মিড ডে মিল রান্না করেন তাঁরা সবাই। বিশেষ করে মাংসের পরিমাণ নিয়ে। ৮০ গ্রাম মাংসের (চিকেন) কারি দিতে গিয়ে গভীর সমস্যার মধ্যে পড়েছেন তাঁরা। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি জানাচ্ছে যে অধিকাংশ গোষ্ঠীর হাতে নেই ক্রয়ক্ষমতা। সরবরাহকারী হিসেবে আসছে তৃণমূলের সিন্ডিকেটের মানুষজন। আর এখানেও দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের জন্য গুণগত মানের যে খাবারের উপাদান দরকার, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সপ্তাহে মাত্র কুড়ি টাকা বরাদ্দ বেড়েছে। তাতে সামলানো দায় বলেও জানাচ্ছেন তাঁরা। শহর কলকাতায় আবার মা ক্যান্টিন চালাতে হয় এই সব স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে। সেখানেও সরকারের কাছে একটা পাওনার ব্যাপার থাকে, তা সত্ত্বেও চালিয়ে যেতে হয় নিয়মিত সরবরাহের কাজ। সঙ্গে মিড ডে মিল। ফলে পাওনা আর নিয়মিত সরবরাহের জায়গায় একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। শিশুরা ব্যঙ্গ করে বলে যে সয়াবিনের তরকারিতে ফোড়নের মতো সয়াবিন বড়ি, সবজি ডালে সবজি খুঁজতে হয় জলের মতো ডালে, সয়াবিনের ঝোলে কাটতে হয় সাঁতার। ডুব সাঁতার দিয়ে আলুর দমে খুঁজে আনতে হয় আলু।

মিড ডে মিলে রাজ্য সরকারকে দিতে হয় ৪০ শতাংশ বরাদ্দ, ৬০ শাতাংশ কেন্দ্রের। বিরোধীদের মতে কেন্দ্রের দেওয়া ওই ৬০ শতাংশেই কাজ সারছে রাজ্যের সরকার। বাকি ৪০ শতাংশ? সেটা আর না বলাই ভালো। অনেকটা সেই প্রবাদের মতো মাছের তেলে মাছ ভাজছে এই রাজ্যের সরকার। বিশেষ করে মিড ডে মিলে। ■

আবাস যোজনায় নজিরবিহীন দুর্নীতি

ভবানী শঙ্কর বাগচী

ঘটনা-১

জামালপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত অফিসের ঢিল ছোড়া দূরত্বে কাঠুরিয়াপাড়া গ্রাম। এই গ্রামেরই এক অংশে নিজের দেড় কাঠা জমিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ির অনুমোদন পান শঙ্কর মাঝি। ঘর তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দও হয় তাঁর নামে। সেটা ২০১৮ সাল। কিন্তু নিজের জমিতে তৈরি হওয়া আবাস যোজনার বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি শঙ্কর মাঝির। নিজের 'পাকাবাড়ি'তে সংসার করার স্বপ্ন অধরা রেখেই প্রয়াত হন। সেই জমিতে এখন দাঁড়িয়ে পুরোদস্তুর একটা পার্টি অফিস। তৃণমূলের 'উন্নয়ন ভবন'। আর স্থানীয় 'উন্নয়ন দাদা'দের দয়ায় শঙ্কর মাঝির পরিবারের ঠাঁই হয়েছে গ্রাম থেকে খানিক দূরে সেচ দফতরের বাঁধের জায়গায়। একচিলতে জমির ওপর পলেস্তরাবিহীন ইটের দেওয়াল। অ্যাসবেস্টসের ছাদ। সেখানেই ঘেঁষাঘেঁষি করে দিন গুজরান করে শঙ্কর মাঝির পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনা-২

উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লক। গ্রামের জনজাতি পাড়ায় ৪০ পরিবারের কারও মাথায় ছাদ নেই। বহু আবেদন-নিবেদনের পরেও মেলেনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা। বিষ্টু মুর্মু, চণ্ডী হাঁসদাদের এখনও রাত কাটে খোলা আকাশের নীচে। অথচ একই গ্রামের গাড়ি-বাড়িওয়ালা সরেস তৃণমূলবাবুদের নাম আবাস যোজনায় তালিকাভুক্ত হয়েছে। এমনকী একই পরিবারের চার-পাঁচজনেরও নাম রয়েছে সেই তালিকায়। ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল ইটাহারের বিডিও-কে। মাথার ওপর ছাদের দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিল আশ্রয়হীন জনজাতিরা। আখেরে কোনও লাভ হয়নি। পাশের গ্রামের সরস্বতী বাদ্যকার, রীতা লোহার, মীরা বাউরিরাও দীর্ঘ পাঁচ-ছ' বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় দরজায় তদবির করে বেড়াচ্ছেন একটা পাকা ঘরের জন্য। এখনও মেলেনি তাদের প্রাপ্য। তেলা মাথায় তেল পড়ছে শাসকদলের কর্মীদের।

ঘটনা-৩

ঝাড়গ্রামের শিলদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মণিকাঞ্চন দত্ত তালিকা থেকে জানতে পারেন তার জন্যও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পাকা বাড়ি বরাদ্দ করেছে সরকার। কিন্তু বছরের পর বছর ঘুরলেও হাতে পাননি বাড়ি তৈরির কানাকড়িও। অনেক ছোটাছুটি হলো। হন্যে হয়ে এর ওর দোরে ঘুরলেন। শেষে খোঁজ নিয়ে জানলেন তাঁর কোটার বাড়ির টাকা ঢুকেছে তৃণমূলের স্থানীয় প্রাক্তন বুথ সভাপতির অ্যাকাউন্টে! অতঃ কিম? প্রতিবাদ জানাতে মণিকাঞ্চন স্ত্রীকে নিয়ে লটবহর সমেত পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে উঠলেন। প্রধানের ঘরের সামনেই গ্যাস ওভেন জ্বেলে দুপুরের রান্না করলেন, খাওয়াদাওয়া করলেন। ঘুমালেন। মণিকাঞ্চন দত্ত সাহসী মানুষ। শাসকদলের নেতাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছেন। কিন্তু যারা শাসকদলের দাপটের মোকাবিলা করতে ভয় পান তারা কী করবেন? বাড়ির যুবতী মেয়েদের সম্মানহানির কথা ভেবে, ছেলেদের ওপর হামলার আশঙ্কায়, সাজানো গাঁজা কেসে জেলে পুরে দেওয়ার ভয়ে প্রতিবাদের পথ থেকে পিছিয়ে আসেন; সেইসব প্রান্তিক মানুষগুলো মাথা গোঁজার ঠিকানা জোগাড় করবেন কীভাবে? এরাজ্যের মানুষের মনে বিগত একুশের ভোট পরবর্তী হিংসার দুঃসহ স্মৃতি যে এখনও তরতাজা!

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দুর্নীতি শব্দদুটো সমার্থক হয়ে গেছে। সর্বত্র কাটমানির খেলা। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির জঞ্জাল উপচে পড়ছে। দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে গোটা রাজ্য। অবশ্য যে দলের চাঁই তার সাগরেদদের প্রকাশ্যে ৭৫-২৫ ভাগাভাগির নিদান দেন সেই দল দুর্নীতির দোসর হবে তা বলাই বাহুল্য।

নিরাশ্রয় মানুষের মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পেও তৃণমূল কংগ্রেসের একের পর এক দুর্নীতির খবর বেরোচ্ছে প্রতিদিন। কোথাও বাড়ি তৈরির বরাদ্দ টাকায় ভাগ বসাচ্ছে তো কোথাও অন্যের কোটার বাড়ি নিজের আত্মীয়ের নামে করে নিয়েছে 'উন্নয়ন ভাইয়েরা'। কেউ কেউ আবার উপভোক্তার নামের টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে দিব্য সুখনিদ্রা দিয়েছে। এমনকী যাদের দোতলা বাড়ি আছে

তারাও আবাস যোজনার টাকা হাতিয়েছে নির্লজ্জভাবে।

ভারতে যে সমস্ত পরিবারের বসবাসের জন্য পাকা বাড়ি নেই, তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি সহযোগিতায় একটি পাকা ঘর তৈরি করে দেবার উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) প্রকল্প চালু করে ভারত সরকারের আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রালয়। দেশজুড়ে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১.৭৫ কোটি বাড়ি তৈরি হয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা লক্ষাধিক। তবে এরাজ্যের মতো আবাস দুর্নীতি অন্য কোথাও হয়েছে বলে খবর নেই। ২০১৭ সালের গোড়া থেকেই বিভিন্ন জেলার বঞ্চিত উপভোক্তারা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছিল। কিন্তু শাসকদলের দাপটের কাছে তাদের অভিযোগ কোনও গুরুত্ব পেত না। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিরোধীশূন্য শাসনে তৃণমূলের ছোটো থেকে বড়ো নেতারা তখন হাতে মাথা কাটছে। একচেটিয়া ক্ষমতার কাছে প্রান্তিক মানুষগুলোর অভাব-অভিযোগ মুখ ফুটে বলা যেন অপরাধের জোগাড়। ইদানীং রাজ্যে শক্ত খুঁটি হিসেবে বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা বদলাতে শুরু করেছে। বিশেষ করে শিক্ষা দুর্নীতিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী-সহ পরপর বেশ কয়েকজন হেভিওয়েটের গ্রেপ্তার হওয়া এরাজ্যের মানুষগুলোর মনে শাসকের মুখের ওপর প্রতিবাদ করার সাহস এনে দিয়েছে। মানুষ এখন মুখ খুলছেন। জেলায় জেলায় আবাস দুর্নীতি নিয়ে শাসকদলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন মানুষ। এমনকী সম্প্রতি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের হালে পানি পেতে যে নেতা মন্ত্রীদের 'দিদির দূত' (বিরোধীদের কথায় 'দিদির ভূত') করে জনসংযোগের জন্য পাঠাচ্ছেন তাদেরও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে।

খবরের কাগজে, নিউজ চ্যানেলে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক শাসকদলের নেতাদের আবাস দুর্নীতির খবর আসছে ফলাও করে। কেউ কেউ সেই নিউজের লিংক সরাসরি ট্যাগ করছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরকে। কাজেই এক্ষেত্রে 'সব বিরোধীদের চক্রান্ত' বলে পার পেয়ে যাবার কোনও পথ নেই। পালাবার রাস্তাটি অবরুদ্ধ। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল সরকারের আনুকূল্যে আবাস যোজনা প্রকল্পে উপভোক্তাদের যে তালিকা হয়েছে তাতে ব্যাপক গরমিল। এমনকী ২০২০ সালে আম্ফান ঝড়ে যে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর ভাঙা পড়েছে তাদের বেশিরভাগের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা হয়নি এখনও। এ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ৬৬ টিরও বেশি দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছে। ইতিমধ্যে আবাস যোজনা নিয়ে একটি মামলায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে।

২০১৭ সালে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম বদলে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা তখন হয়েছিল বাংলা আবাস যোজনা। শুধু তাই নয়, তাঁর কোপানলে পড়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার নামও রাতারাতি বদলে গিয়ে হয়েছিল 'বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনা'। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের এই নাম বদলের খেলায় গোয়েবল্‌স থিয়োরিতে অভ্যস্ত গ্রামবাংলার মানুষও প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন দিদিই সব দিচ্ছেন। আর কেন্দ্র দিদির ঋণের সুদ কেটে নিচ্ছে, দিচ্ছে না কিছুই। আপাদমস্তক এমন 'পরের ধনে পোদ্দারি'র উদাহরণ লিখতে গেলে উপন্যাস হয়ে যাবে। মাঝে নাম বদলের ইস্যুতে আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র। তড়িঘড়ি তখন তৃণমূল প্রকল্পের আগের নাম ফিরিয়ে এনেছে। তারপর এসেছে বরাদ্দ। মজার কথা, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কেন্দ্র আবাস যোজনার বরাদ্দ দিতেই বেরিয়ে পড়েছে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় কারা কারা বাড়ি পাওয়ার যোগ্য সেই তালিকা তৈরির দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকার যে তালিকা করে পাঠাবে তার ভিত্তিতেই টাকা আসবে প্রাপকের অ্যাকাউন্টে। এখানেই সরষের মধ্যে ভূত ঢুকিয়েছে শাসকদলের নেতা-কর্মীরা। বাড়ি তৈরি নামের তালিকায় বেশিরভাগ জেলাতেই স্বজনপোষণের অভিযোগ সামনে আসছে। ইতিমধ্যেই আবাস যোজনার দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে কেন্দ্রীয় তদন্ত দল রাজ্যের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করে সাধারণ মানুষের মুখেই শুনছেন তৃণমূলের পুকুর চুরির বিবরণ। যত শুনছেন, অবাক হচ্ছেন।

এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। রাজ্যের মানুষের জন্য প্রচুর কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা রয়েছে এবং তা এক্সিকিউট করার স্বাধীনতা রাজ্যের হাতে দিয়েছে কেন্দ্র। মমতা সরকার হলপ করে বলতে পারবে কি যে তারা রাজ্যবাসীর দোরগোড়ায় সেইসব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে ১০০ ভাগ সততার সঙ্গে কাজ করে? এবং তারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য যথার্থ উন্নয়নের কাজ করেছে? দুর্নীতির শিকড় এ রাজ্যে এত গভীরে নেমেছে যে সাধারণ মানুষের ভুরিভুরি অভিযোগ জমছে আদালতে। আর তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে প্রায়ই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পাঠাতে হচ্ছে তদন্তের জন্য!

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ৯ জানুয়ারি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বসতবাটির সভাকক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতার অমৃতকাল উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার হালহকিকত'। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল সব্যসাচী বাগচী ও অমিতাভ সেন। কর্নেল বাগচী তাঁর দীর্ঘ সমর অভিজ্ঞতার বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন। সত্তরের দশকে অস্ত্রসম্ভার বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। আজ দেশের অভ্যন্তরেই মজুত রয়েছে অস্ত্রভাণ্ডার আর দেশীয় প্রযুক্তিতে দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। দেশের অর্থনীতির পতন-উত্থানের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন শ্রীসেন। দুই বক্তার আলোচনা থেকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহ বাড়তে থাকে। বেশ কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর দেন দুই বক্তা। সার্বিকভাবে সবার মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগরণের উদ্দেশ্য সফল হয়। সভা পরিচালনা করেন প্রদীপ চক্রবর্তী এবং সমাপ্তি বক্তব্য রেখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রয়াত ডাঃ সুজিত ধরের কন্যা সুপ্রদীপ্তা দত্ত। একেবারে নেপথ্যে থেকে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন ডাঃ ধরের সহধর্মিণী শ্রীমতী মহুয়া ধর।

কসবা রাজডাঙ্গা নারকেল বাগান মাঠে গীতাজয়ন্তী

গীতা জয়ন্তী উৎসব কমিটির উদ্যোগে কসবা রাজডাঙ্গা নারকেল বাগান মাঠে গত ৭-৮ জানুয়ারি দুদিন ব্যাপী গীতাজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। এলাকার ষাটটিরও বেশি মঠ-মন্দির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। গীতাপাঠ, ধর্মীয় আলোচনা সভা, সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের দ্বারা ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন, আলপনা প্রতিযোগিতা, শ্রীকৃষ্ণলীলা আধারিত নৃত্য-গীত, ভজন সংকীর্তন, গীতা ও মহাভারত সম্পর্কিত কুইজ প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। শিশু, বালক-বালিকা ও যুবকদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। চক্রধারী কেশব-সহ বাড়ির গোপাল বিভিন্ন মন্দিরের ধ্বজ রাজডাঙ্গার জোড়া মন্দিরে একত্রীকরণ, নগর সংকীর্তন, বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ, সম্পূর্ণ গীতাপাঠ, অন্নভোগ নিবেদন ও আরতি সংকীর্তন— সমস্ত অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

ফঃ ৪

সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলার অনুষ্ঠান ‘স্বতন্ত্রতা’

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন এবং কলাঋষি পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্রজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সিউড়ি রবীন্দ্র সদন মঞ্চে গত ৯ জানুয়ারি সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা নিবেদন করে ‘স্বতন্ত্রতা’ নামের এক বিশেষ মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। সংস্কার ভারতীর ঐতিহ্য অনুসারে ভাবসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠনের শুভারম্ভ হয়। অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার সুব্রত নাগ, সংস্কার ভারতীর সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী এবং প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি চার ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথি বরণ ও সম্মাননা পর্ব। এই ভাগেই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় শিল্পী শীর্ষ আচার্যকে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে সংস্কার ভারতী যে কৃষ্ণ রূপসজ্জা প্রতিযোগিতার অয়োজন করেছিল তার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দ্বিতীয় ভাগে সমরজিৎ চক্রবর্তীর পরিচালনায় বীরভূম শাখার শিশু-কিশোর মঞ্চের শিল্পীরা নিবেদন করে ‘অমৃত গীতি’। সবার আগে জন্মভূমি। তারপরে বর্ণ, সম্প্রদায়। এই ভারত চেতনার সঞ্চারে ভারতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রাথমিক শর্ত— এই ভাবনা মাথায় রেখে একদিন ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। ঋষি অরবিন্দের বাণী ‘মুক্তিপিপাসু জাতিকে রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে পবিত্র হয়ে লাভ করতে হয় স্বাধীনতার আশীর্বাদ’। তাঁর সার্ধশতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করে বীরভূম জেলার সংহতি গোষ্ঠীর শ্রদ্ধার্ঘ্য ছিল ‘দীপঙ্কর শ্রীঅরবিন্দ’।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালি নারীদের অসামান্য সাহসিকতা এবং দেশমাতৃকার জন্য প্রাণদানের ঘটনাকে আর একবার স্মরণ করে নিতে, তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পরিবেশিত হয় নাটক ‘বহ্নি বিহঙ্গ’। নাটক পরিচালনা করেন স্বরূপ সরকার। শেষে বন্দেমাতরম্ গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সনাতনী হিন্দু সমাজের উদ্যোগে স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

উত্তর দমদম নগর সচেতন সনাতনী হিন্দু সমাজের উদ্যোগে এবং স্বামীজী জন্মোৎসব সমিতির পরিচালনায় গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী ও জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সুসজ্জিত ট্যাবলো-সহ স্বামীজীর বাণীপাঠ ও গান গেয়ে এলাকা পরিক্রমা করা হয়। ১৫০ জন স্বামীজী অনুরাগী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নির্মল কুমার মাইতি, বিশিষ্ট চিকিৎসক অর্চনা মজুমদার, ডাঃ সুজিত ব্যানার্জি, মধুসূন শেঠ প্রমুখ।

গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর শাখার উদ্যোগে কলকাতা শহিদমিনার ময়দানে 'নেতাজী লহ প্রণাম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সকাল ৯টায় তিনি ময়দানে উপস্থিত থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রীভাগবতের সঙ্গে সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল এবং হাওড়া মহানগর সঙ্ঘচালক সঞ্জয় বসু। অনুষ্ঠানে স্বয়ংসেবকরা ঘোষ (বাদ্য), নিযুদ্ধ, আসন, ব্যায়ামযোগ ও দণ্ড (লাঠি) প্রদর্শন করেন। সরসঙ্ঘচালক স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বলেন, প্রখর জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সুসম্পর্ক ছিল। দেশের স্বাধীনতার বিষয়ে কয়েকবার তাঁদের মধ্যে কথপোকথন হয়। তিনি দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নিয়মিত ভাবেই তাঁর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে থাকেন।

ময়দানে পাঁচ হাজার স্বয়ংসেবক পূর্ণগণবেশে উপস্থিত ছিলেন। নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্ধেন্দু বসুও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার গান্ধীগ্রামস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে বলেন, আজকের যুব সমাজকে স্বামীজী নির্দেশিত পথে চলেই ভারতেকে বিশ্বগুরু বানাতে হবে।

স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ার মুড়লু গ্রামে বীণাপানি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বামীজীর আবির্ভাব দিবসে শোভাযাত্রা , বৈদিক যজ্ঞ, যুব সম্মেলন দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যোগপীঠ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সোমনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ, শালতোড়া বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা বাউরি, তরুণ ব্রহ্মচারী পরিব্রাজক রাজা পাণ্ডে। সেদিন সকালে ভারতমাতা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত ট্যাবলো-সহ শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। তারপর বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ শুরু হয়। সকাল

১১টায় সালতোড়া বিএড কলেজের ম্যাজেনিং ডিরেক্টর স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে রক্তদান শিবিরের উদ্‌ঘাটন করেন। ৯জন মহিলা-সহ ৬৩ জন রক্ত দান করেন।

যুব সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারতমাতা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন সোমনাথ ব্রহ্মচারী। মঞ্চাসীন অতিথিদের চন্দনের ফোঁটা, উত্তরীয় ও পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে বরণ করেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার অরুণ কুম্ভকার। ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী সোমনাথ মহারাজ। স্বামীজীর জীবন দর্শন নিয়ে আলোকপাত করেন ব্রহ্মচারী রাজা পাণ্ডে। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে ২০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। শেষে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিশ্ব হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

বিশ্ব হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ জানুয়ারি কলকাতার রোটারি সদনে রামগোপাল সোহিনীদেবী চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে তৃতীয় সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে শুভারম্ভ করেন হীরামণি নাগোরী, বংশীধর শর্মা , শ্রীবল্লভ নাগোরী। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক অ্যাডভোকেট বংশীধর শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উীডওয়ানা নাগরিক সভার সম্পাদক হরীশ তিওয়াড়ী। সম্মাননীয় অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে অভিনন্দন জানান শ্রীমতী প্রভাদেবী, সরিতা, নিশা নাগোরী ও পুনম সাদানী। সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও গত ৬ জানুয়ারি বিড়লা তারামণ্ডলে হিন্দি কবিতা এবং আলেখ বাচন প্রতিযোগিতার প্রারম্ভিক পর্ব এবং ১৪ জানুয়ারি রোটারি সদনে অন্তিম পর্ব সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতায় ক বিভাগ থেকে বৈভব কুমার চৌধরী, ওয়ান্যা নেওর, আর্যন নেওর, খ বিভাগ থেকে পরিধি সিংহল, হর্ষিকা খন্না, বেদাঙ্গ শাহ, গ বিভাগ থেকে কৃষ কটারুকা, বশিষ্ঠ রুংগটা, দেবাংশী নাথানী এবং ঘ বিভাগ থেকে দেবর্ষ নেওর, আয়ুষী পাণ্ডে, লক্ষা খন্নাকে ক্রমানুসারে পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করা হয়। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবী চিৎলাঙ্গিয়া, হিমাদ্রি মিশ্রা, প্রতিভা সিংহ, স্নেহলতা বৈদ, রঞ্জনী মুন্ধড়া ও অরবিন্দ সিংহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শ্রীমতী অলকা মাহেশ্বরী ও নীলম চৌধরী।

ধর্ম জিজ্ঞাসা— চার

সত্যই ভারত-সাধনার মূলকথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ। এই তিন নিয়েই চিরন্তন প্রশ্ন— কোথা থেকে এসেছি, জন্মের পর কেই-বা বেঁচে থাকবে, কারণ আবার প্রলয়ে কোথায় হবে স্থিতি?

অতীত-বর্তমান-আগামীর জিজ্ঞাসার মালায় গাঁথা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, পুরো ব্যাপারটা যাঁর অধীন তাঁরই নাম সৃষ্টিকর্তা। আদিতে যিনি এক, তাঁর বহু হবার কামনাতেই এই জীবজগতের সৃষ্টি। সৃষ্টির পর তাকে সজীব ও ক্রিয়াশীল রাখতেই তিনি নিলেন পালকের ভূমিকা। আবার স্বাভাবিক নিয়মেই যখন আসে প্রলয়, আসে জীবনান্তের সময়, তখন তিনিই হন বিনাশক।

এক তিনি, আবার এই তিন রূপেও তিনি। তিনিই দেবতা— পরম দেবতা। শুধু জীবজগৎ নয়, দেবতা ও দেবলোকেরও দেবতা তিনিই। তিনি নিত্যশক্তি। গুণময় হয়েও গুণাতীত তিনি। যে ব্রহ্মচক্রে আবদ্ধ জীব বা মানুষ, তার আবর্তন ঘটে তাঁরই অর্থাৎ পরমদেবতার শক্তিতে। তাঁর প্রসাদ বা সাযুজ্য লাভেই ঘটে মুক্তি। একাধারে স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিনাশক তিনি জীবের মুক্তিদাতা।

এই যে বিরাট পুরুষ বা পরম দেবতা, তিনিই পরমশক্তির আধার। ব্যক্ত-অব্যক্ত, ক্ষর-অক্ষর, অজ্ঞ-বিজ্ঞ সবই তিনি। তিনিই ঈশ, অনীশও তাঁরই রূপ। বিচিত্র তাঁর ব্যবহার। তাঁর প্রতিটি কর্মেই রয়েছে আশ্চর্য বৈপরীত্য আবার বিস্ময়কর সাদৃশ্য। তিনি ভোগ্য, ভোক্তা ও প্রেরিতা। তিনি এক, তিনও তিনিই। আবার ত্রিরূপে প্রকাশিত হওয়ার পরও তিনি সেই আদি-এক-অনন্ত। এ কারণেই তাঁকে জানলেই মুক্ত হয় মানুষ— মেশে সেই অনন্তেই।

প্রায় এইভাবে পরমদেবতা বা পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং কর্মের বর্ণনা করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈজন্মমৃত্যুপ্রহাণি'— এই দেবতা বা পরমেশ্বরকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে পারলেই সাধকের সব অবিদ্যার বাঁধন ছিঁড়ে যায়। ওই অবিদ্যার জন্য যে পাঁচরকম ক্লেশ ভোগ করে মানুষ তার অবসান হলে জন্ম-মৃত্যুরও নিবৃত্তি হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ উদ্‌গীত মুণ্ডক উপনিষদের একটি রূপক মন্ত্রে। উপনিষদে এই দেহকে কখনও রথ, কখনও নদী, কখনও-বা বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই দেহবৃক্ষেরই একটি ডালে বসে আছে দুটি শোভনপক্ষ পাখি— মুখোমুখি। ভারী ভাব দু'জনের। তাদের মধ্যে একটি ওই গাছেরই পাকা ফল খাচ্ছে আর অন্য পাখিটি নির্বিকার ভাবে দেখছে।

এই দৃশ্যটির উল্লেখ করে ঋষি অঙ্গিরা জিজ্ঞাসু শৌনককে বলেন, 'দ্বা সুপর্ণা সযুজ সখয়া—' ওই দুই পাখির মধ্যে ফল খাচ্ছে যে, সে হলো জীবাত্মা আর নির্বিকার দর্শকটি হলো পরমাত্মা।

এই রকম নানা রূপক ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অঙ্গিরা যা বলেন, তার সার কথা— বিদ্যা হলো দু' রকম— পরা ও অপরা। পরা হলো ব্রহ্মবিদ্যা, আর তাছাড়া বেদ ইত্যাদি সবই হলো অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যার সাহায্যেই জানা যায় সেই অক্ষরকে, যিনি অ-বর্ণ অথচ সার্বগত, সকলের উৎপাদক। এই অক্ষর থেকেই উৎপত্তি এই মহাবিশ্বের এবং যাবতীয় অন্য সবকিছু। মাকড়সার থেকে যেমন হয় তার জাল, পৃথিবী থেকে ওষধি কিংবা পুরুষ থেকে হয় যেমন কেশ, লোম, অনেকটা সেই ভাবেই অক্ষর থেকে হয় অন্ন, অন্ন থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে সত্য এবং তা থেকেই হয় বিভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি। লোক সমূহেই হয় কর্মের অনুষ্ঠান এবং তাঁর

থেকে অনিবার্যরূপে সৃষ্টি হয় কর্মফলের। সেটাই অমৃত। ব্রহ্ম থেকে এই যে নানা সৃষ্টি— তার নাম কিন্তু এক নয়, বহু। বহিরঙ্গে অর্থাৎ নামে প্রভেদ থাকলেও অন্তরে তারা সবই এক— সবই ব্রহ্ম।

এই একত্বের রূপটি বোঝাতেই দেওয়া হয়েছে একটি সুন্দর উদাহরণ। আগুন জ্বলে উঠলে তার ফুলকিগুলি উৎক্ষিপ্ত হয় উপরে, আগুনের শিখার মতো ওই ফুলকিগুলিও একই রকম উজ্জ্বল। তার মধ্যে থাকে আগুনেরই শক্তি। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সেই উৎক্ষিপ্ত ফুলকিগুলি আবার মিশে যায় আগুনেই। অর্থাৎ যেখান থেকে তাঁর উৎপত্তি, বিলয়ও সেইখানেই।

একইভাবে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকেই জন্ম নানা জীবের নানা নামে। অন্তিমে তারা সকলেই কিন্তু মিশে যায় সেই নামহীন ব্রহ্মসাগরেই। ব্যাপারটাকে তুলনা করা হয় নানা নামে খ্যাত নদীগুলির সাগরে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে। সাগরে মিলিত হওয়া নদীগুলির থাকে না কোনো আলাদা পরিচয়। পৃথকও করা যায় না তখন তাদের। একইভাবে জীবাত্মা বিলীন হয় সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেই— সেই পরমাত্মাতেই।

সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এই পরমাত্মা। তা অনেক দূরের এবং একবারে কাছেরও। আসলে সবকিছু জুড়েই রয়েছে পরমাত্মা। সব কিছুতেই তাঁর অবস্থান। আপাত বহু তিনি আসলে এক, যা কিছু দৃশ্যমান— চলমান— সবই তাঁর এক একটি রূপ। অনেকটা অভিনেতা বা বহুরূপীর মতোই এক তিনি প্রকাশ হন নানারূপে— নানা চরিত্র হিসেবে।

এই যে তিনি— তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জীবের মধ্যে আবহমানকাল থেকে একই বেগে প্রবাহিত। ধ্যানের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় তাঁকে। আর এই পাওয়ার পর আর কোনো আকাঙ্ক্ষাই থাকে না— শেষ হয়ে যায় সব চাওয়া-পাওয়া। শেষ হয় সব জানাও। পরমাত্মার দর্শনেই হৃদয়গ্রন্থি যায় খুলে। সব সংশয়ের হয় অবসান, ক্ষীণ হয় সর্ব কর্ম, নিষ্ক্রিয়তাই তখন সক্রিয়তার একটি রূপ।

হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক স্বরূপের এটা একটা সাধারণ পরিচয়। আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে, আরও বিষদে বলতে গিয়ে মুনি-ঋষিরা বলেন, পরমাত্মা হলেন সত্যস্বরূপ— তদেতৎ সত্যম্ (মুণ্ডক ২।১), সেই অক্ষর পুরুষই সত্য। সত্যস্বরূপ-জ্যোতির্ময় সেই পুরুষের কোনো মূর্তি নেই— আকারও নেই। তিনিই রয়েছেন অন্তরে— বাইরেও দেখা যায় তাঁকেই। তাঁর থেকেই উৎপত্তি নিখিল বস্তুজগতের ধারয়িত্রী ধরনীর। আর এই কারণেই জয় হয় সত্যের— অসত্যের নয়। সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ (মুণ্ডক ৩।১।৫০), সত্যনিষ্ঠার মধ্যেই অবিচ্ছিন্ন দেবযান পথের বিস্মৃতি। তাই এককথায় বলা যায়, পরমাত্মাকে লাভ করার দিব্য বা শ্রেষ্ঠ পথ হলো সত্য।

তপস্যা, সম্যক জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্যও হলো আত্মাকে পাওয়ার আরও তিনটি পথ। তবে শ্রেষ্ঠ বা প্রথম পথটিই হলো সত্য। এ ব্যাপারে মুণ্ডক উপনিষদের নির্দেশ— সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্ (৩।১।৫) অর্থাৎ সত্য-নিষ্ঠা, তপস্যা, নিয়ত ব্রহ্মচর্য এবং সম্যগ্ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের মধ্য দিয়েই হৃদয়াকাশে উদ্ভাসিত শুদ্ধ জ্যোতির্ময় সেই আত্মাকে লাভ করা যায়। এখানে সত্য অর্থে সত্যের উপলব্ধি এবং তার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। মিথ্যাচারী ও মিথ্যাজ্ঞানীরা কখনই আত্মাকে লাভ করতে পারে না।

হিন্দুর ধর্মসাধনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সত্য। সত্য ভাষণ থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যিনি সত্যকে অনুসরণ করতে পারেন মন-প্রাণ দিয়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চার বর্ণের যে কুলেই জন্ম হোক না কেন, সত্যের দর্শন অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎ তিনি পাবেনই। মুক্তি তার অনিবার্য।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বারবারই সত্যের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। পিতার সত্যরক্ষায় রামের যে সিংহাসন ত্যাগ করে বনে গমন— সে তো আজও সত্যের মহিমাই ঘোষণা করছে। সত্যের জন্য জীবনদানও ভারতীয় ধর্মসাধনারই একটি অঙ্গ। কেবল বেদ বেদাঙ্গর মতো বৈদিক শাস্ত্রগুলিই নয়, বিভিন্ন পুরাণও একই ভাবে সত্যের জয়গাথায় মুখর।

এ সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনির কথা বলার আগে আবারও একবার উপনিষদে চোখ রাখা যাক। দেখা যাবে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বহু জায়গায় সত্যের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে— ব্রহ্ম হলেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ। হৃদয়ের দিব্যাম্বরে বুদ্ধিরূপ গুহায় স্থিত এই ব্রহ্মকে যিনি জানেন বা দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে একই ভাবে সবরকম কাম্যবস্তু ভোগ করেন। —সত্যম্ জ্ঞানমনন্ত্যং ব্রহ্ম (২।১।২) —ব্রহ্মই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। এ কারণেই তৈত্তিরীয় উপনিষদের চিরন্তন শাশ্বত উপদেশ হলো, সত্যং বদ— সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ (১।১১।১)— সত্য বলবে ধর্মের অনুষ্ঠান করবে— সত্য থেকে কখনও ভ্রষ্ট হবে না অর্থাৎ সত্যানুষ্ঠান থেকে বিরত হবে না। এবং এসবই যদি কর তাহলেই তোমার ধর্মজীবন হবে সার্থক। এমনই আশীর্বাদ করেন আচার্য তাঁর শিষ্যকে শিক্ষা সমাপন শেষে। এটাই হলো চিরন্তর সমাবর্তনের পরম দীক্ষান্ত ভাষণ।

ব্রহ্ম সম্পর্কিত তত্ত্বকথাগুলি সবসময় সকলের বোধগম্য নাও হতে পারে। এ কারণেই সাধারণের জন্য নানা পুরাণ রচনা ভারতীয় ধর্ম-ইতিহাসের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বে সত্যস্বরূপের যে কথা বলা হয়েছে তাকেই পুরাণে কথিত হয়েছে নানা কাহিনির সাহায্যে অত্যন্ত সহজভাবে। যেমন সত্য সম্পর্কে নানা পুরাকথার মধ্যে বরাহ পুরাণের একটি কাহিনিকে অবশ্যই স্মরণ করা যায় এই ক্ষেত্রে।

মহাতপা আরুণি। দেবীকা নদীর তীরে তাঁর আশ্রম। রোজই নদীতে অবগাহন করে নারায়ণ নামজপ করেন তিনি। এটা তাঁর নিত্যকর্ম। কিন্তু সেদিন দেখেন এক করালদর্শন ব্যাধ তাঁরই দিকে তির-ধনুক উঁচিয়ে রয়েছে। যে কোনো সময় তার ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত শর বিদ্ধ করতে পারে তাঁকে। সেই মুহূর্তে ব্যাধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অন্য কোনো রাস্তা দেখতে পেলেন না তিনি। তাই নদীতে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে থাকেন তাঁর আরধ্য নারায়ণকে।

লক্ষ্য স্থির। ব্যাধ এবার তির ছুঁড়বে।

এমন সময় একী বিভ্রম। ব্যাধ দেখে মুনিকে ঘিরে রয়েছে যেন এক তীব্র জ্যোতির্ময় বলয়। চোখ ধাঁধিয়ে যায় ব্যাধের। হাত থেকে খসে পড়ে তির-ধনুক।

এদিকে আরুণি একসময় উঠে আসেন নদী থেকে। তিনি তীরে উঠতেই ব্যাধ কাঁপিয়ে পড়ে তাঁর পায়ে। বলে, আমি মহাপাপী। এক হাজার ব্রাহ্মণ আর পাঁচ হাজার নারীকে হত্যা করেছি আমি। এই মহাপাপ থেকে রক্ষা করুন আমাকে। কোনো কথা না বলে আরুণি চলে যান আশ্রমে। আর সেখানেই বসে থাকে ব্যাধ, যদি দয়া হয় মুনির, এই আশায়।

আরুণি নিয়ম মতো রোজই আসেন। স্নানের পর মন্ত্র জপ শেষে চলে যান। দেখেও তিনি দেখেন না ব্যাধকে। ব্যাধের অপেক্ষা চলতেই থাকে। নদীতে স্নান এবং নদীর জল পান করে সেখানেই দিন কাটে তার। হঠাৎই অঘটন ঘটল সেদিন। আরুণি রয়েছেন নদীতে। এমন সময় এক ভয়ংকর বাঘ তাঁর ওপর দেয় এক লাফ।

আরুণি তখন জপে ধ্যানমন্ত্র। ব্যাধ তা দেখে মুহূর্তে তুলে নেয় তার তির-ধনুক। অব্যর্থ শরে হত্যা করে সেই বাঘকে। আর সেই সময়ই আরুণি পাড়ে উঠে নারায়ণ! নারায়ণ! বলে উচ্চকিত হন। আবার বিস্ময়। সেই বাঘ তখন এক দীর্ঘকায় মানুষ। বলেন, নাম তাঁর দীর্ঘবাহু। ক্ষত্রিয় রাজা তিনি। শস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রেও ছিল পারঙ্গমতা। তারই ফলে মনে জন্মায় অহমিকা। অবজ্ঞা করতে থাকেন ব্রাহ্মণদের। অপমাণিত ব্রাহ্মণরা অভিশাপ দেন, এত দম্ভ! বাঘ হয়ে যাও তুমি। সে অভিশাপে চৈতন্য ফেরে। অনুনয় বিনয় করতে থাকেন তিনি। ব্রাহ্মণরা বলেন, কথা যখন বলেছি তখন তা ফলবেই। বাঘ তেমাকে হতেই হবে। সাতদিন অন্তর সামনে যাকে পাবে সেই হবে তোমার আহার। তবে সে সময় কেউ যদি তোমায় তিরবিদ্ধ করে এবং তোমার সেই মরণ সময়ে কেউ যদি শোনায় নারায়ণের নাম, তাহলেই শাপমুক্ত হবে তুমি।

আর তাই হয়েছে। অপনার কৃপায় মুক্ত হলাম আমি। আপনকে প্রণাম। বলেই অদৃশ্য হন রাজা দীর্ঘবাহু। আরুণি ফিরে যান আশ্রমে ব্যাধকে কোনো কথাই না বলে।

কাটে আরও কিছুদিন। তারপর আসে সেই শুভমুহূর্ত। স্নান জপ সেরে আশ্রমে যাওয়ার পথে আরুণি থমকে দাঁড়ান ব্যাধের সামনে। বলেন, এতদিন তোমার মনে ছিল কুটিলতা। কিন্তু নিত্য নদীতে স্নান আর নারায়ণের নাম শুনে তুমি আজ শুদ্ধ পবিত্র। যাও এবার, নির্জনে বসে করো নারায়ণের ধ্যান।

আরুণির নির্দেশ মতোই তপস্যা করতে থাকে ব্যাধ। সেসময় প্রথমে গাছ থেকে কচিপাতা ছিঁড়ে খেত। পরে এক অদৃশ্য নির্দেশে গাছের তলায় পড়ে থাকা পাতা হলো তার খাদ্য। তারপর ওই রকমই নির্দেশে নিরাহারে চলে তার তপস্যা। দীর্ঘ উপবাসে দেহ হয় তার কঙ্কালসার। তবুও বিরাম নেই তার নাম জপ ও ধ্যানের।

তার ওই কঠোর তপস্যা দেখে একদিন পরীক্ষা করার জন্য দুর্বাসা বলেন তাকে ক্ষুধার্ত আমি। শিগগির ভালো করে খাওয়াও আমাকে।

ব্যাধ পড়ে বিপদে। সে নিজে তো কিছু খায় না। তাই নেই কোনো আহার্য। এখন ক্ষুধার্ত অতিথিকে কী দেবে সে খাওয়ার জন্য। অতিথি অভুক্ত থাকলে যে মহাপাপ হবে। তাই প্রার্থনা জানায় বিপদতারণ নারায়ণের কাছে, উদ্ধার করো প্রভু।

হঠাৎ-ই তার হাতে এসে পড়ে একটি সোনার থালা। দুর্বাসাকে অপেক্ষা করতে বলে, ব্যাধ সেই থালা নিয়ে নগরে যায় ভিক্ষার জন্য। সেখানে অযাচিত ভাবেই সে পায় প্রচুর খাদ্যসামগ্রী।

ফিরে এসে দুর্বাসাকে আহারের জন্য আহ্বান জানিয়ে ব্যাধ তাঁকে নদী থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসতে বলে, উত্তরে দুর্বাসা বলেন, ক্ষুধায় অবসন্ন তিনি। নদীতে যাওয়ার ক্ষমতা নেই তাঁর। কিন্তু নদীর জল ছাড়া আচমন করা হবে না তাঁর। তাই শীঘ্র নদীর জল আনার নির্দেশ দেন তিনি।

আবার বিপদে পড়ে নারায়ণ ও দেবিকা নদীরই স্তুতি করে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। কী আশ্চর্য! দেবিকা নদী খাত বদলে দ্রুত চলে আসে একবারে তাদের কাছে।

তুষ্ট ও বিস্মিত দুর্বাসা এবার ব্যাধকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ধন্য তুমি! ধন্য তোমার তপস্যা। আজ থেকে নাম তোমার সত্যতপা। তুমি হবে শাস্ত্রজ্ঞ। বেদ পাঠী—সুপণ্ডিত। ব্যাধ বলল, অধম শূদ্র আমি। আমার তো বেদপাঠের অধিকার নেই। দুর্বাসা বলেন, তপস্যার বলে তুমি শুদ্ধ। বেদ পাঠের অধিকার জন্মেছে এখন তোমার।

শুরু হয় সত্যতপার বেদপাঠ। আরও কঠোর তপস্যার জন্য সত্যতপা যান হিমালয়ে। পুষ্পভদ্রা নদীতীরে চলে তাঁর সাধনা।

কাটে বহুদিন। এবার তার তপোবন পরীক্ষার জন্য আসেন বিষ্ণু ও দেবরাজ ইন্দ্র। এলেন তাঁরা ছদ্মরূপে। ইন্দ্র ব্যাধ আর বিষ্ণু হন বরাহ। সত্যতপার আশ্রমের কাছে ব্যাধরূপী ইন্দ্র তাড়া করেন বরাহরূপী বিষ্ণুকে। সত্যতপা দেখে তারই আশ্রমের এক কোনে লুকিয়েছে বরাহ। ব্যাধ ইন্দ্র এসে সত্যতপাকে বলেন, একটি বরাহকে কি এখানে দেখেছো? সেটি আমার শিকার। আজ শিকার নিয়ে যেতে না পারলে অনাহারে মারা যাবে আমার পরিবার। সত্যি করে বলো, বরাহকে কোথায় লুকিয়েছে।

সত্যতপার এ এক ধর্মসংকট। সত্যি বললে মরবে বরাহ আর মিথ্যে বললে মরবে সপরিবারে ব্যাধ। কী করবে বুঝতে না পেরে সত্যতপা এবার ডাকতে থাকে নারায়ণকেই। পথ দেখাও ঠাকুর! পথ দেখাও! কী করব এখন আমি?

তার সেই প্রার্থনার মুহূর্তে স্বরূপে প্রকাশিত হলো বিষ্ণু আর ইন্দ্র। বলেন, ধন্য তুমি। মঙ্গল হোক তোমার।

কাটে আরও কিছুদিন। তারপর একদিন সত্যতপার আশ্রমে আসেন আরুণি। বলেন, সিদ্ধ হয়েছে তোমার সাধনা। সত্যকে জেনে তুমি হয়েছো সত্যময়। এখন ফুরিয়েছে তোমার কাজ, আমারও। এবার চলো গুরু-শিষ্য দু'জনে যাই নারায়ণ ধামে।

তাই হলো, তাঁরা মিললেন নারায়ণের সঙ্গে। আশ্রমে পড়ে রইল শুধু দুটি নিষ্প্রাণ দেহ।

সত্য-সাধনাই যে সবচেয়ে বড়ো সাধনা সেই কথাটিই বারবার বলা হয়েছে এই পুরাকাহিনিতে। □

প্রথম ভারতীয় শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত আধুনিক ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তার বহু আগে প্রায় ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শল্য চিকিৎসা নিয়ে কিংবদন্তী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ভারতীয় চিকিৎসক সুশ্রুত। ভারতবর্ষে বাগভট্ট পর্যন্ত এই শল্যবিদ্যায় অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রাধান্য ছিল। মনুর সময় থেকে তা নিষিদ্ধ হয় এবং তা অশুচি বলে ঘোষিত হয়।

১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করার পর ওই বছর ২৮ অক্টোবর চারজন সাহসী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রকে দিয়ে মেডিক্যাল শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে তিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়েছিলেন। এই চারজন ছাত্রের নাম রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত, উমাচরণ শেঠ এবং নবীন চন্দ্র মিত্র। মধুসূদন গুপ্ত তার আগে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপক।

এদিকে ১৮৩৩ সালে দেশে মেডিক্যাল চিকিৎসার মান যাচাই করবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। গঠন করেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। সভাপতি ছিলেন সি.জে. গ্রান্ট, তার একমাত্র ভারতীয় সদস্য রামকমল সেন। এই কমিশন পরের বছরই সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয়।

কমিশন জানায়, ভারতে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা নেই, ফলে দেশীয় শিক্ষাদান রীতিমতো অসম্পূর্ণ। তাই কমিশন সরকারকে পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করে। আর বন্ধ করার পরামর্শ দেয় সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাকে এবং স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরসকে, কারণ সেখানে মেডিক্যাল শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না।

আর এর পরেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় শবব্যবচ্ছেদের। বিরোধী রক্ষণশীলদের বাধা উপেক্ষা করে ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৬ সালে ভারতে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করলেন। তার আগে তিনি নিজের কাজের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণও উদ্ধৃত করলেন এবং বৌদ্ধিকভাবে দূর করলেন কাজের সমস্ত বাধা।

১৮৩৫ সালের ১৭ মার্চ তাঁকে নব প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর হিসেবে নিয়োগ করল ব্রিটিশ সরকার। পূর্বে তিনি ছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়াদের শিক্ষক পণ্ডিত। এবার হলেন ডিমনস্ট্রেটর।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই পদে থেকে তিনি নিজেও নিজের ছাত্রদের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাস করলেন এবং ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করলেন ১৮৪০ সালে। হয়ে উঠলেন আধুনিক মেডিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তার। নিযুক্ত হলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হিন্দুস্থানি মেডিক্যাল ক্লাসের সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে। ১৮৪৮ সালে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে নিযুক্ত করা হলো।

১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের বাংলা শ্রেণীরও সুপারিন্টেনডেন্ট হলেন তিনি। তাঁকে দেওয়া হলো অ্যানাটমি ও সার্জারি শিক্ষার সমূহ ভার। ডাঃ গুপ্ত রচনা করলেন চিকিৎসা শিক্ষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তাঁর তৈলচিত্র এখনও রয়েছে। ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের জন্ম হুগলীর বৈদ্যবাটিতে ১৮০৬ সালে, তাঁর মৃত্যু ১৫ নভেম্বর ১৮৫৬। □

মরিচঝাঁপির ৪৪ বছর
কী ছিল গণহত্যার সম্ভাব্য কারণ?

দেবযানী ভট্টাচার্য

পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে— এমন আশঙ্কাতেই নাকি মরিচঝাঁপি দ্বীপ ছাড়বার নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে গিয়েছিল দণ্ডকারণ্য থেকে পালিয়ে আসা মানুষগুলোর কাছে। দণ্ডকারণ্যের রুক্ষ, বন্ধ্যাজমিতে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের উদ্‌বাস্তু মানুষ মন বসাতে পারেনি, নদী সান্নিধ্য ছাড়া জীবনধারণের অভিজ্ঞতা কৃষিজীবী মানুষের ছিল না। কিন্তু সুন্দরবনের মাটি লবণাক্ত হলেও তাতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁরা। কর্মঠ, উদ্যমী নমঃশূদ্ররা সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের মরিচঝাঁপি দ্বীপে নিজেদের পুরুষকার ও উদ্যমে দু'বছরের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন অনেক কিছু। এমন সময় আসে দ্বীপ ছাড়বার নির্দেশ। কল্পনা তাঁরা করেননি যে পূর্ববঙ্গে গণহত্যার মুখ থেকে বেঁচে পালিয়ে আসার পর এদেশেও হতে পারেন গণহত্যার শিকার। তাই দ্বীপভূমি ছাড়বার সরকারি নির্দেশে কর্ণপাত না করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তাঁরা। আদতে বামফ্রন্ট সরকারের ওপর তাঁদের ছিল অগাধ ভরসা, এ তাঁদের নিজেদেরই সরকার। উপরন্তু, বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থনও করেননি বামফ্রন্টের নেতারা। আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে দণ্ডকারণ্যের উদ্‌বাস্তুদের তাঁরা এরাজ্যে ফিরিয়ে আনবেন।

হিন্দু বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তু ও মরিচঝাঁপি

বাঙ্গালি উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসন হেতু ১৯৫৮'য় তৈরি হয়েছিল ভারত সরকারের দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট। এমন স্থান যেখানে ১০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য আর ৯০ শতাংশ পাথুরে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্‌বাস্তুদের যেখানে বড়ো অঙ্কের ক্ষতিপূরণ-সহ এদেশে গ্রহণ করা হয়েছিল সসম্মানে, দেওয়া হয়েছিল ভারতের নাগরিকত্ব, সেখানে পূর্বপাকিস্তানের উদ্‌বাস্তুদের দেওয়া হয়েছিল একখানি 'উদ্‌বাস্তু' পরিচয়পত্র, নামমাত্র ভাতা, আর পাঠানো হয়েছিল দণ্ডকারণ্যের বন্ধ্যা জমিতে কিংবা সুদূর আন্দামানে। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেই দণ্ডকারণ্যের মানুষগুলো তাই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে। একদল নির্ভয়ে সোজা গিয়ে উঠেছিলেন মরিচঝাঁপি দ্বীপে।

মরিচঝাঁপি গণহত্যার বহুচর্চিত বর্ণনা আর নয়

মরিচঝাঁপি গণহত্যার আর একখানি বর্ণনা দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়।

ফ ঃ ৫

রক্তাক্ত সেই দ্বীপের বাতাসে আজও পাওয়া যায় মানুষের রক্তের ঝাঁঝালো গন্ধ। গভীররাতে খাঁড়ির নোনাজলের তলা থেকে শোনা যায় মহিলাদের গোঙানির আওয়াজ, শিশুর কান্না আর সদ্য মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের গর্জন। সে এক ভূতুড়ে ব্যাপার। জলজঙ্গলের সেই দ্বীপের ধোঁয়াটে, জোলো অন্ধকারের মধ্যে এখনও দেখতে পাওয়া যায় অনেক ছায়ামূর্তি। রিজার্ভ ফরেস্টের বাঘগুলোর তখন আচমকাই খুলে গিয়েছিল ভাগ্য। অপ্রত্যাশিতভাবে তারা পেয়েছিল একের পর এক মানুষের রক্তমাংসের স্বাদ। গণহত্যার পর দেহ সৎকারের ঝামেলা এড়াতে এমনই ছিল বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের অভিনব পরিকল্পনা। লোকে বলে প্রমাণ লোপাট আর জ্যোতি বসু বলেছিলেন সংবাদমাধ্যমের বাড়াবাড়ি। সরকারি হিসেব অনুযায়ী মারা গিয়েছিল মাত্র দু'জন। মরিচঝাঁপি গণহত্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও অনুমানের আগে ভারতের রাজনীতিতে জ্যোতি বসুর আগমন ও কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকপাত আবশ্যক। যে জ্যোতি বসু মেহনতি ছোটো কৃষকের সশক্তিকরণের স্বার্থে 'অপারেশন বর্গা' করেছিলেন, সেই বসুই কেন মরিচঝাঁপি দ্বীপের কয়েক সহস্র মেহনতি সহায়সম্বলহীন কৃষকমানুষের বেঁচে থাকার স্বনির্ভর উদ্যোগকে পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলেন, সেই দ্বিচারিতার তাৎপর্য সম্যক বুঝতে হলে স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জ্যোতি বসুর উত্থানের প্রেক্ষাপটটির ওপর আলোকপাত অনিবার্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জ্যোতি বসুর আগমনের পর থেকে এরাজ্য কেবলই এগিয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের পথে, অঙ্কের ভাষায় যাকে বলে monotonic decay. পশ্চিমবঙ্গের এহেন রূপ পরিবর্তনের প্রজেক্টটির একটি আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি এবং সেই সূত্রে ১৯৪০ সালে এদেশে ফিরে জ্যোতি বসুর কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যোগদান করার বিষয়টিও পূর্ণত তাঁর একার পরিকল্পনা না হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। কিন্তু এ ধরনের পর্যবেক্ষণ অনুমাননির্ভর। এমন অনুমানের নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি? নির্ভুল হলেই-বা কতখানি নির্ভুল হওয়া সম্ভব? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে এবং মরিচঝাঁপি গণহত্যার প্রকৃত কারণ অনুমানের স্বার্থে তৎপূর্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটটি স্মরণ করা আবশ্যক।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন স্বয়ং উইনস্টন চার্চিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় উইনস্টন চার্চিল ছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যের ফার্স্ট লর্ড অব অ্যাডমিরালটি অর্থাৎ রাজসিংহাসনের পরে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির সর্বময়কর্তা। ১৯৪০-এর মে মাসে তিনি হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। এই বছরেই লন্ডন থেকে আইন পড়া শেষ করে ভারতে চলে আসেন জ্যোতি বসু এবং ঝাঁপিয়ে পড়েন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। জ্যোতি বসুর ভারত তথা বাঙ্গলায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাড়বাড়ন্ত। এতটাই যে বসুকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা যায়। শ্রমিকের অধিকারের পক্ষে সওয়াল করতে করতে জ্যোতি বসু যে আদতে নেতিবাচক পরিবর্তন আনছিলেন ভারতীয় শ্রমিকের কাজের পরিবেশে, ক্ষেত্রপ্রস্তুত করছিলেন কাজের সুযোগ হ্রাসের এবং বেঙ্গল প্রভিন্সের শ্রমজীবী মানুষের কর্ম-মননে ঘটাচ্ছিলেন নঞর্থক ভাব বদল, তা সেই সময় তত অনুভূত হয়নি, কারণ কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারণা তখন এদেশে একেবারে নতুন এবং মানুষ তার স্বরূপ ও অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে অবহিত ছিল না। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মাধ্যমে বেঙ্গল প্রভিন্সের মানুষ ক্রমে হয়ে উঠছিল উৎক্ষিপ্ত, নেতিবাচক, অর্ধচিন্তক। ব্রিটিশ শাসনকালে ব্রিটিশের আদর্শগত সম্মতি ও পরোক্ষ সহযোগিতা ভিন্ন এই ধরনের নেতিবাচক আন্দোলন শুরু করা রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নবাগত, অনভিজ্ঞ জ্যোতি বসুর পক্ষে যে সম্ভব ছিল না তা আন্দাজ করা দুরূহ নয়।

জ্যোতি বসুর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : অর্থসংস্থান কোথা থেকে?

দেশীয় সম্পদশালী মানুষ তথা জমিদারদের সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে সওয়াল করার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি বসু যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের সরকারি ট্রেজারিতে কুক্ষিগত আরও বহু সহস্রগুণ অধিক ভারতীয় সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবিটিও তোলেননি, সেই আপাতবৈষম্যটি সেই সময় তেমন দৃষ্টিগোচর হয়নি। ঔপনিবেশিকতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন সাধারণ ভারতীয় জনগণের মনে রাজার জাত হিসেবে ব্রিটিশের প্রতি যে এক অসহায় আত্মসমর্পণের ভাব ছিল তা দেশীয় রাজা জমিদারদের প্রতি তদনুরূপ ছিল না। সেইটিকে কাজে লাগিয়েই সম্পদশালী দেশীয় রাজা জমিদারদের হাত থেকে সম্পদ কেড়ে নেওয়ার জন্য লোক খেপানোর রাজনীতি শুরু করেছিলেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের প্রফেসর হ্যারল্ডলাসকির লেকচারমুগ্ধ জ্যোতি বসু। বিরাট মাপের ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট গড়ে তুলতে যে অর্থসংস্থান প্রয়োজন, জ্যোতি বসুকে তা সেই সময় জোগাচ্ছিল কে বা কারা? দেশীয় জমিদারদের 'বুর্জোয়া' চিহ্নিত করা অথচ ব্রিটিশ সরকারকে তা না করা বা ব্রিটিশ সরকারের ট্রেজারিতে ভারতীয় সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়া নিয়ে কার্যত নীরব থাকা— এর দ্বারা যে ট্রেজারির উপচে পড়া ভারতীয় সম্পদ সম্পূর্ণভাবেই ব্রিটিশের ভোগে লাগার পথ আরও প্রশস্ত করা হচ্ছিল না তার নিশ্চয়তা নেই। জ্যোতি বসু যেহেতু তুলছিলেন কেবলমাত্র দেশীয় সম্পদশালী মানুষদের সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবি, ফলে এদেশের ধনীসম্প্রদায় যে জ্যোতি বসুর এহেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যয়ভার বহন করছিলেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহলে তাঁর আন্দোলনের 'গৌরীসেন' হিসেবে পড়ে রইল কারা?

লোকখেপানোর, অস্থিরতার রাজনীতি

১৯৪০-এ কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর অনতিবিলম্বেই জ্যোতি বসু শুরু করেন রেল শ্রমিকদের সংগঠিত করে হরতাল পালনের কাজ। এর মাধ্যমে দেশে শুরু হয়ে যায় কমিউনিস্ট ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলন যা আদতে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী যার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে এ রাজ্যে বন্ধ হয় একের পর এক উৎপাদনশিল্প এবং কর্মহীন হন বহু মানুষ। ভারতের অর্থনৈতিক উৎপাদন হ্রাসের কারণ ঘটতে শুরু করে এই সময় থেকে। ১৯৪১-এ বেঙ্গল-অসম রেলওয়েতে পার্টির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন জ্যোতি বসু এবং রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। ১৯৪৩-এ অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে ক্যালকাটা পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন তিনি এবং ততদিনে তাঁর অধীনে বেঙ্গল-অসম রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪০০০, যাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন ঢাকা, কলকাতা, কাঁচড়াপাড়া, ময়মনসিংহ, রংপুর ও অসমে।

জ্যোতি বসু : নেতাজীকে ঠেকাতে চার্চিলের প্রতিনিধি?

১৯৪৩-এ অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে যখন দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, পৃথিবীতে তখন চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করছে ভারতীয় সৈন্যরা এবং যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজন দর্শিয়ে 'rice bowl of India' নামে খ্যাত বেঙ্গল প্রভিন্স থেকে বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ভারত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত ও ক্রমাগত। যুদ্ধের বাজারে যুদ্ধের নামে লাগামহীন এই ব্রিটিশ লুঠের মুখে দেখা দেয় কুখ্যাত বেঙ্গল ফ্যামিন এবং এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে পরাজিত হন উইনস্টন চার্চিল। যদিও তিনি ভেবেছিলেন যে যুদ্ধ জিতেছেন বলে নির্বাচনে পরাস্ত হবেন না। কিন্তু চার্চিলের ভ্রান্তনীতির কারণে ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের দুর্ভিক্ষে প্রাণ যাওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে লন্ডনে এবং পরাস্ত হন চার্চিল।

১৯৪৫-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে উইনস্টন চার্চিলের পরাজয়ের আগে পর্যন্ত জ্যোতি বসুকে ব্রিটিশ বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি। কিন্তু যতশীঘ্র সম্ভব ব্রিটিশ তাড়ানোর কথা তিনি প্রথমবার বলেন ১৯৪৬-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তখন ক্লেমেন্ট অ্যাটলি। তারপর ১৯৪৬-এর

মরিচঝাঁপি গণহত্যায় পুলিশের গুলির মুখে বেঁচে ফেরেন সফল হালদার।

ব্রিটিশ বিরোধী নৌবিদ্রোহেও সমর্থন জানায় কমিউনিস্ট পার্টি। অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহ থেকে এমন প্রতীত হয় যে উইনস্টন চার্চিল যতদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, জ্যোতি বসু ব্রিটিশ বিরোধিতা করেননি। জ্যোতি বসু কি ছিলেন আদতে উইনস্টন চার্চিলের লোক? সুভাষচন্দ্র বসু--- উইনস্টন চার্চিলের অন্তহীন শিরঃপীড়ার কারণ হচ্ছিল এই একটি নাম। বুঝে উঠতে পারছিলেন না সুভাষকে ঠেকাবেন কী উপায়ে। তারপর পেলেন পথ? জ্যোতি বসুকে নির্দেশ দিলেন সুভাষের প্রখর জাতীয়তাবাদী সোশ্যালিজমের মোকাবিলায় সোশ্যালিজমের নামে বিধ্বংসী কমিউনিজম নিয়ে নামতে। দু'জনের পদবির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন হারলে ব্রিটিশ পরবর্তী বেঙ্গল প্রভিন্সের পতন নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল জ্যোতি বসুর ওপর?

বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দিনগুলিতে চার্চিল জানতেন না কী হতে চলেছে যুদ্ধের পরিণাম। জয় যদি অক্ষশক্তির (জার্মানি-জাপান-ইতালি) হয় তবে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে তৎক্ষণাৎ এবং আর থাকবে না ভারতবর্ষের সম্পদ শোষণ করার সুযোগ। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ পরবর্তী বেঙ্গল প্রভিন্সের অর্থনৈতিক পতন কামনা না করার কোনো কারণ চার্চিল সাহেবের ছিল না বিশেষত ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মোট উৎপাদনের (জিডিপি) ৩৫-৪০ শতাংশই যেখানে আসত বেঙ্গল প্রভিন্স থেকে। ব্রিটিশের ভোগে যদি না লাগে বেঙ্গল প্রভিন্সের সম্পদের ক্ষয়ই তবে বাঞ্ছনীয়--- এমন ভেবেছিলেন চার্চিল? উপরন্তু তিনি জানতেন যে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাণ তাঁর দেশ ও দেশের মানুষ। এহেন নেতাজীকে প্রকৃত অর্থে ঠেকানোর জন্য বেঙ্গল প্রভিন্সের মানুষের মনের ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনও আবশ্যক ছিল। জয় অক্ষশক্তির হলেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতিবাচক প্রভাব বেঙ্গল প্রভিন্সের মনের মধ্যে তদ্দিনে গুঁজে দেবে বিষাক্ত গজাল, যে গজাল উপড়ে ফেলতে জীবিত থাকলে বেগ পেতে হবে এমনকী সুভাষচন্দ্র বসুকেও--- এমনই ভেবেছিলেন উইনস্টন চার্চিল? বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন হারলে যুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীতে প্রাক্তন উপনিবেশের দুর্দশা উপভোগ করতে চাওয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না এবং এই সবক'টি উদ্দেশ্য একত্রে চরিতার্থ করার অব্যর্থ উপায় ছিল ভারতে তথা বেঙ্গল প্রভিন্সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে দেওয়া। ১৯৪০ সাল থেকে তাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বেঙ্গল প্রভিন্সে জ্যোতি বসুর লোকখেপানোর সফর। সুভাষের রাজ্যের মানুষের মনকে সুভাষমুক্ত করে অন্যরকম করে দেওয়ার দায়িত্ব এঁর ওপর সঁপেছিলেন উইনস্টন চার্চিল? প্রশ্ন করা অনুচিত নয় বিশেষত ইতিহাসের অনেক সূত্রকেই যখন একবিন্দুতে মিলিত হতে দেখা যাচ্ছে।

দেশীয় জোতদারদের সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন, ব্রিটিশ ট্রেজারির সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবিতে নয় কেন?

১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষের সময় কমিউনিস্ট

পার্টির তরফ থেকে গড়ে তোলা হচ্ছিল ‘গণখাদ্য কমিটি’, যে কমিটিগুলি গুদামে জমিয়ে রাখা খাদ্যসামগ্রী গণবণ্টনের জন্য বের করে দিতে বেঙ্গল প্রভিন্সের দেশীয় মজুতদার ও কালোবাজারিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এমন নয় যে সব মজুতদারই সেই সময় কালোবাজারি করতে খাদ্যশস্য মজুত করেছিলেন। অনেকে করেছিলেন যুদ্ধের বাজারে নিজেদের ভবিষ্যৎ খাদ্যভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখতে। উপরন্তু, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২-এ এদেশের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনও আদতে পরিণত হয়েছিল অরাজক লুঠপাটে যে সময় ব্রিটিশ সরকার বসেছিল প্রায় হাত গুটিয়ে, অরাজকতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টামাত্র না করে। লুঠপাটের সেই পরিবেশে নিরাপত্তাহীনতা থেকে বাঁচতেও মানুষ খাদ্যশস্য মজুত করেছিল।

১৯৪৩-এর এহেন ঝোড়ো সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির বেঙ্গল প্রভিন্সের প্রদেশ কমিটিতে নির্বাচিত হন জ্যোতি বসু। দেশীয় মজুতদারদের ওপর জোর করলেও ব্রিটিশের দ্বারা ভারতীয় সম্পদের যথেচ্ছ লুঠের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময় করেনি। তারপর ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে ইউনিয়নের নেতা হিসেবে জ্যোতি বসু অংশগ্রহণ করেন ‘তেভাগা আন্দোলন’-এ, যার মাধ্যমে অবিভক্ত বেঙ্গল প্রভিন্সের খাদ্যসংকট দূরীকরণে কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীরা তোলেন উৎপন্ন কৃষিপণ্যের তিন ভাগের দু’ভাগ চাষিকে দেওয়ার দাবি, জমি মালিকরা নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন একভাগ।

অর্থাৎ একদিকে যেমন ধনী ভারতীয়দের সঞ্চিত সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের নামে খোলাবাজারে টেনে এনে সেই সম্পদে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটানোর দাবিতে উত্তাল আন্দোলন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যদিকে তেমনই এই সুযোগে ব্রিটিশের তরফ থেকে এদেশের সম্পদ দেদার লুঠ করার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনই তারা করেনি। এর মাধ্যমে সরকারি ট্রেজারির সম্পদে ব্রিটিশের নিরঙ্কুশ অধিকারে পরোক্ষ সিলমোহর তারা দিয়েছিল কিনা এবং তার ফলে ব্রিটিশের পক্ষে ভারতীয় সম্পদের অধিকতর শোষণের পথ সুগম হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন যৌক্তিক ও বিচার্য। এই সময় থেকেই ভারতের সম্পদসামগ্রী জাহাজ ভরে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ জনগণ এবং এ সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অনেক মানুষ। জাহাজ বন্দরের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মুখ্য প্রতিনিধি তখন জ্যোতি বসুই। ভারতের সম্পদ নির্বিঘ্নে ও মসৃণভাবে ব্রিটেন পাঠানোর কাজে সাহায্য করতেই দেশীয় ধনী সম্প্রদায়ের সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের ধুয়ো কমিউনিস্ট পার্টি তুলেছিল কিনা পক্ষপাতহীন আলোচনার স্বার্থে সে প্রশ্ন তোলা আবশ্যক।

১৯৪৬ : জ্যোতি বসুর প্রথম ব্রিটিশ বিরোধিতা

১৯৪৪-এ জ্যোতি বসু হয়ে উঠলেন কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান নেতা। রেলওয়ে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির শ্রকিমদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করলেন এবং গড়ে তুললেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন যার সাধারণ সম্পাদক হলেন তিনি নিজে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং বেঙ্গল দিল্লি রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে যাওয়ার পর এই বছরই জ্যোতি বসু নির্বাচিত হন নতুন এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং সেই সঙ্গে নির্বাচিত হন অলইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সম্পাদক হিসেবেও। ১৯৪৬-এ রেলওয়ে কর্মচারীদের কোটা থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচনে লড়েন জ্যোতি বসু এবং নির্বাচিত হন কংগ্রেসের হুমায়ুন কবীরকে হারিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় খাদ্যসংকটের সমাধান হিসেবে জমিদারি প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের পক্ষে আবেগঘন বক্তৃতা করেন তিনি এবং এই সময়ই প্রথম বলেন যত দ্রুত সম্ভব তাড়াতে হবে ব্রিটিশদের। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তখন ক্লেমেন্ট অ্যাটলি, চার্চিল নন। চার্চিল থাকলেও ব্রিটিশ তাড়ানোর কথা জ্যোতি বসু বলতেন কিনা, ইতিহাস পর্যালোচনার স্বার্থে সে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন।

১৯৪৬ : নৌবিদ্রোহেও সমর্থন কমিউনিস্ট পার্টির—

ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহের সমর্থনে ক্রমাগত রেল ধর্মঘট সংগঠিত করতে থাকেন জ্যোতি বসু এবং পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের জেল থেকে মুক্ত করেন অনেক রাজনৈতিক বন্দিকে। মুক্ত হওয়ার পর এঁদের অনেকেই কৃতজ্ঞতাবশত যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যদিও অন্তরে এঁরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং চাইতেন ভারতের প্রকৃত উত্থান। কিন্তু ১৯৪০ সাল থেকে কমিউনিস্ট রাজনীতি দিয়েই রাজনীতিতে যাঁর উত্থান, সেই জ্যোতি বসুর প্রকৃত লক্ষ্য কী ছিল? বন্দি মুক্তির দাবিতে ক্রমাগত রেল ধর্মঘটের আয়োজন করে আপাতদৃষ্টিতে দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন জ্যোতি বসু।

(১) হরতাল সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে গঠনমূলক বেঙ্গল প্রভিন্সের মানুষের মনে রোপণ করেছিলেন সংঘর্ষপ্রবণতার বীজ যা ভাবীকালের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল মহীরুহ আকারে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির অঙ্কুরোন্মেষ যে সেই সময়ে, চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

(২) মুক্তি পাওয়া বন্দিদের অধিকাংশই ছিলেন অবিভক্ত বাঙ্গলার বিপ্লবী। তাঁদের এক বড়ো অংশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া নিশ্চিত করেছিলেন বসু, কারণ আড়েবহরে বাড়তে হলে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল।

১৯৯৬ সালে ইউনাইটেড ফ্রন্টের হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসনে জ্যোতি বসুকে বসানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বসুর মতে তা ছিল এক ‘ঐতিহাসিক ভুল’। সে ‘ভুল’ যদি না হতো, তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে সর্বাঙ্গীণ ধ্বংসের যে নেশা গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ধরিয়েছিলেন বসু, সেই নেশার মৌতাত জমানোর প্রয়াস করতেন বাকি ভারতবর্ষের মনেও।

(ক্রমশ)

কৃত্রিম পায়ে স্বপ্নপূরণ অমৃতসরের আবলুর

বিশেষ প্রতিনিধি॥ ২০০৯ সালের এক পড়ন্ত বিকেলে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিল আবলু। স্কুল থেকে ফেরার পথে সেদিন ট্রেন দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হয় ১৪ বছরের পড়ুয়াটি। অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয় তাঁর দুটো পা। শোকাহত বাবা-মা, পাড়াপড়শি, বন্ধুবান্ধব সবাই ভেবেছিল তাদের আবলুর স্বাভাবিক জীবনটাই বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে গেল নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে!

কিন্তু সবার যাবতীয় দুশ্চিন্তা দূর করে একদিন আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো অমৃতসরের হার না মানা দুরন্ত যুবক। কৃত্রিম পায়ের উপর শুধু দাঁড়ানোই না, দৌড়ে, সাইকেল চালিয়ে, কোরিওগ্রাফি করে আবলু রাজেশ কুমার সমাজকে বার্তা দিল 'এভাবেও ফিরে আসা যায়'। সেদিন দুটো পা হারিয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পরিবার-পরিজনের সামনে চোদ্দ বছরের কিশোরটি বলেছিল, 'একটা দুর্ঘটনার কারণে আমার স্বপ্নগুলোকে আমি হারিয়ে যেতে দেব না।' ক্লাস এইটের পড়ুয়ার এই আত্মপ্রত্যয় শুধু কথার কথা ছিল না। বাস্তবে সে তা করেও দেখিয়েছে।

পঞ্জাবের অমৃতসরে বেড়ে ওঠা আবলুর ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল একজন নৃত্যশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার। দুর্ঘটনায় দুটো পা-ই বাদ যাওয়ায় সেই স্বপ্নের বিসর্জন হতে বসেছিল। কিন্তু অদম্য মনের জেদকে সঙ্গী করে আজ সে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও সাইক্লিস্ট। তবে সাফল্যের এই যাত্রাপথ সহজ ছিল না। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা, তারপর কৃত্রিম পায়ের ওপর দাঁড়ানো এবং হাঁটা, শুরুর দিকে পুরো ব্যাপারটাই ছিল যন্ত্রণাদায়ক। আবলুর কথায়, 'এত যন্ত্রণা, এত কষ্টের মধ্যে মনে হত এসব চেষ্টা করে কী লাভ! এ পৃথিবীতে অনেকেই আছেন যাদের পা নেই, হাত নেই; তারাও তো বেঁচে আছেন। সেই হতাশা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠেছি। বিশ্বাস করেছি যন্ত্রণা ভুলে স্বপ্নগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।'

একদিকে কৃত্রিম পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটা, তারপর টিভিতে নাচের বিভিন্ন রিয়েলিটি শো দেখা। এভাবেই প্রতিদিনের রুটিন সাজিয়েছিল আবলু। প্রস্থেটিক পায়ে হাঁটতে অভ্যস্ত হওয়ার পরেই সে অমৃতসরের একটা ডান্স অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি সে প্রয়োগ করে নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য। বছর কয়েকের কঠোর অনুশীলনের পর জনপ্রিয় ডান্স রিয়েলিটি শো 'নাচ বলিয়ে' ও টিভি রিয়েলিটি শো ''ইন্ডিয়া'স গট ট্যালেন্ট'-এর মূলপর্বে নিজের নাচের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পায় আবলু রাজেশ কুমার। সারা ভারত আশ্চর্য হয়ে যায় তার কৃত্রিম পায়ের ডান্সিং স্কিল দেখে। পঞ্জাবি টিভি ট্যালেন্ট শো 'হুনর দা পঞ্জাব'-এ দ্বিতীয় হন আবলু।

আবলুর এই ইচ্ছাশক্তি এবং জীবন সংগ্রাম আমাদের মনে করায় শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী সুধা চন্দ্রনের কথা। তাঁর খ্যাতি যখন মধ্য গগনে, গাড়ি দুর্ঘটনায় দু'পা হারিয়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিল হুইল চেয়ার। সেই সুধা চন্দ্রনই আবলুর প্রেরণা। তিনি বলেন, 'কাটা পায়ের ক্ষত যখন শুকিয়ে আসছে, আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাঁদতাম। একদিন মা আমায় ইউটিউবে সুধা চন্দ্রনের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ফিল্ম 'নাচে ময়ূরী' দেখালেন। আমি জীবনে নতুন করে বাঁচার মানে খুঁজে পেলাম। নিজেকে বললাম আমার স্বপ্নগুলোও পূরণ করতে হবে। তারপর সুধাজীর সম্পর্কে আরও পড়লাম। জানলাম। ওনার আত্মজীবনী আমায় আবার উঠে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে। ওনার সময়ে প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স এত উন্নত ছিল না। আর এখন অ্যাডভান্সড টেকনোলজি এসেছে। সুধাজীর মতো আমিও পেরেছি স্বপ্ন পূরণ করতে।' গত ১৫ আগস্ট দেশ যখন স্বাধীনতা দিবস পালন করছে, তখন ২৭ বছর বয়সী আবলু রাজেশ কুমার ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে কৃত্রিম পায়ে ভর করে এক কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই ভিডিয়ো মুহূর্তে ভাইরাল হয়েছে। সাড়ে চার লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে তাঁর ভিউয়ারের সংখ্যা।

তবু নিজের প্যাশন থেকে দূরে সরে যাননি আবলু। স্বপ্নটাকে আগলে রেখে এগিয়ে চলেছেন। বলেন 'এখনও অনেক পথ বাকি'।

সৎ পথে উপার্জন

এক নগরে অত্যন্ত সদাচারী বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার অবস্থা খুব ভালো ছিল না। কোনোরকমে দিন কাটতো। সেখানকার রাজাও খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী অনেক

বার তার স্বামীকে রাজার কাছে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যেতে রাজি হননি। ব্রাহ্মণী বারাবার স্বামীকে অনুরোধ করে বলতেন, তোমাকে তো রাজার কাছে কিছু চাইতে বলছি না, শুধু একবার দেখা করে এসো। বার বার বলার পর ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত রাজার কাছে গেলেন। রাজা একজন ধার্মিক সৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে দেখে অত্যন্ত খাতির যত্ন করে বললেন, আপনি আর একদিন আসুন। আজ তো আপনি নিজের ইচ্ছাই এসেছেন, অন্য একদিন আমার ইচ্ছাই আসুন। এই বলে রাজা সেদিন তাকে সসম্মানে বিদায় জানালেন। বাড়ি ফিরলে ব্রাহ্মণী বললেন, রাজা তোমাকে কী দিলেন? ব্রাহ্মণ বললেন, রাজামশাই খুব সম্মান জানিয়েছেন। তবে উনি আর একদিন যেতে বলেছেন। ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবলেন, তাহলে সেদিন কিছু পাওয়া যাবে।

এরমধ্যে রাজা একদিন ছদ্মবেশে নগর ঘুরতে বেরিয়েছেন। শীতের দিন ছিল। এক কামারশালে লোহার কড়াই তৈরি হচ্ছিল। রাজা তার কাছে গিয়ে কাজ পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলেন। কামারের লোহা পেটানোর জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। কামার বলল একঘণ্টা কাজ করলে দু' পয়সা পাওয়া যাবে। রাজা তাতেই রাজি হলেন আর দুঘণ্টার মধ্যেই কাজটা শেষ করে দিলেন। রাজার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। খুব ঘেমে গেলেন, আর পরিশ্রমও হলো প্রচুর। কামার তাঁকে চারটি পয়সা দিল। রাজা তাই নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

বেশ কিছুদিন পর ব্রাহ্মণীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ রাজার আবার কাছে এলেন। রাজা সসম্মানে তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। যাবার সময় রাজা ব্রাহ্মণের হাতে চারটি পয়সা দিলেন। ব্রাহ্মণের কোনো লোভ ছিল না। তিনি তাতেই খুশি হয়ে পয়সা চারটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্রাহ্মণী ভেবে রেখেছিলেন, আজ হয়তো অনেক টাকাপয়সা পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণীর হাতে চারটি পয়সা তুলে দিলেন তখন ব্রাহ্মণী বললেন, তুমি যেমন পণ্ডিত আর তেমনই তোমার দানবীর রাজা! এই বলে পয়সা চারটি উঠোনে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

পরদিন সকালে উঠে ব্রাহ্মণী দেখেন, উঠোনের চারকোণে চারটি সোনার দণ্ড মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। ব্রাহ্মণও দেখলেন। তারা ভাবলেন ভগবান হয়তো দয়া করেছেন। তারা সোনার দণ্ড রোজ কেটে বিক্রি করতে লাগলেন। তাদের অভাবও মিটে গেল। তারা গরিবদের দানধ্যান করতে লাগলেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! দণ্ডচারটি কেটে নিলেই পরদিন আবার নতুন দণ্ড গজিয়ে ওঠে। একদিন তারা দণ্ডের গোড়ার মাটি খুঁড়ে দেখলেন, দণ্ডের গোড়ায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া ওই চারটি পয়সা রয়েছে। তার থেকেই সোনার দণ্ড গজিয়ে উঠেছে।

রাজা কিন্তু ব্রাহ্মণকে খাদ্যসামগ্রী বা সোনাদানা দেননি। কেননা রাজার অর্থ মাদকদ্রব্যের ওপর ধার্য কর, দুষ্টদের দণ্ডস্বরূপ জরিমানা ইত্যাদি অসদুপায়ে অর্জিত। এরূপ অসদুপায়ে অর্জিত টাকা ব্রাহ্মণকে দান করে রাজা ধর্মচ্যুত হতে চাননি। তাই তিনি নিজের পরিশ্রম-লব্ধ চারটি পয়সা ব্রাহ্মণকে দিয়েছিলেন।

ছোটো বন্ধুরা, গল্পের তাৎপর্য হলো, সৎপথে উপার্জিত অর্থই সৎ কাজে দান করা উচিত। আর তাতেই ভগবান খুশি হন।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের বিপ্লবী

বীণা দাস

বিপ্লবী বীণা দাস ১৯১১ সালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদিবাড়ি চট্টগ্রাম। তাঁর বাবা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষক তথা প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক বেণীমাধব দাস। বাবার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে তিনি দেশসেবায় বিপ্লবীদলে যোগ দেন। কলিকাতা বেথুন কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ছোটো ছোটো দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার গভর্নরকে লক্ষ্য করে তিনি গুলি চালান। এজন্য ন'বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁকে। স্বাধীনতার পর তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। মরিচঝাঁপি গণহত্যার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর শেষ জীবন বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি হরিদ্বার চলে যান। ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঋষিকেশে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় পথপ্রান্তে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- বাল্মীকিকে আদিকবি এবং রামায়ণকে আদিকাব্য বলা হয়।
- রামায়ণ মহাকাব্য শ্রেণীর রচনা।
- রামায়ণে ২৪ হাজার শ্লোক আছে।
- রামায়ণে ৭টি কাণ্ড ও ১৮টি অধ্যায় আছে।
- ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শ্লোক বাল্মীকির রচনা।
- রামায়ণ অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা।
- দু'হাজারেরও বেশি হাতে লেখা পুঁথি আকারে রামায়ণ পাওয়া যায়।

ভালো কথা

পাখিকে খাবার দেওয়া

আমাদের পাড়ার সরস্বতী কাকিমা প্রতিদিন সকালে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেই একঝাঁক পায়রা উড়ে বসে। কাকিমা তখন একটা ছোটো থলি থেকে গম বের করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে থাকেন। পায়রাগুলো মহাআনন্দে খেতে থাকে। ওগুলো শেষ হয়ে গেলে পায়রা গুলো কাকিমার মাথায়, গায়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে উড়ে চলে যায়। কাকিমার দেখে অনেকে রাস্তায়, মাঠে চাল গম ছড়িয়ে দেয়। অনেক কাক, শালিক, ঘুঘু এসে ওগুলো খায়। কিন্তু কোনো পাখিই তাদের গায়ে মাথায় বসে না। দাদু বলছিল, মন শুদ্ধ না হলে মানুষের কাছে ওরা আসে না।

কৌশিক দাঁ, সপ্তম শ্রেণী, কেষ্টদাস পাল লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বড়ো ছোটো

স্নেহা সরদার, একাদশ শ্রেণী,ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

বড়োরা যে ছোটোদের
সদাই বলে গাধা,
বড়োরা কি জানে না
তারা ছোটোদেরই দাদা।
বড়োদের শুধু দাদাগিরি
ভাবখানা যেন আহা মরি,
ছোটোরাও জানে অল্প
বড়োদের থেকে স্বল্প।

দু' একটি দাদা খুবই ভালো
ছোটোদের তারা বাসে ভালো,
স্নেহভরে শেখায় কত
সুযোগ পেলে সময় মতো।
সব দাদা যদি এমন হয়
তাহলে কত ভালো হয়,
বড়োর স্নেহ ভালোবাসা
ছোটোরা তো করে আশা।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

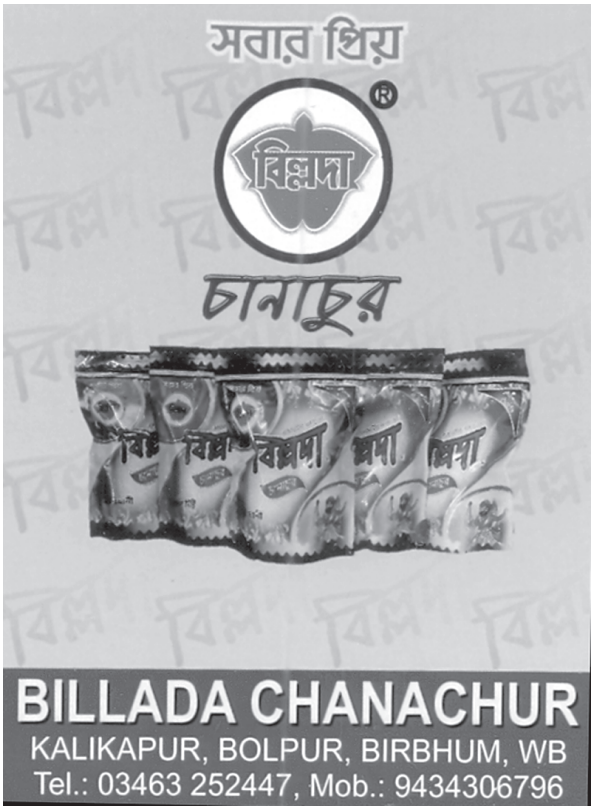

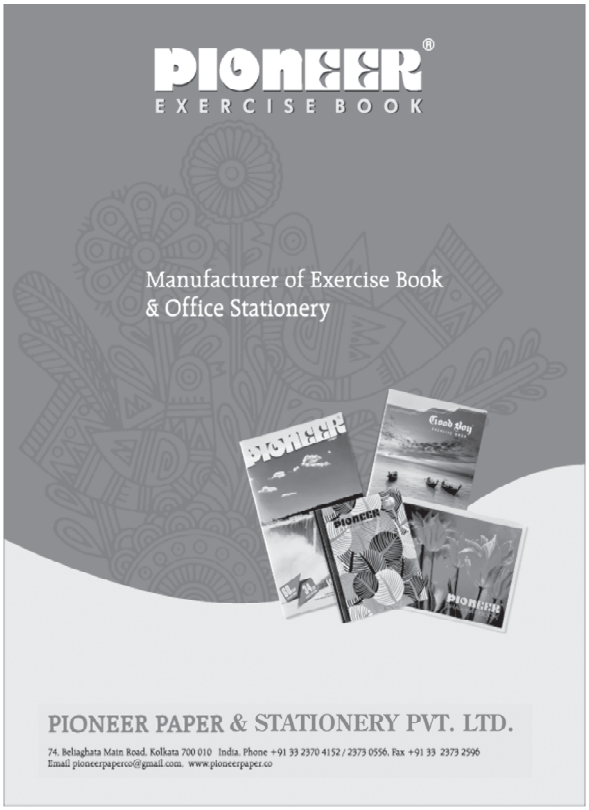

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

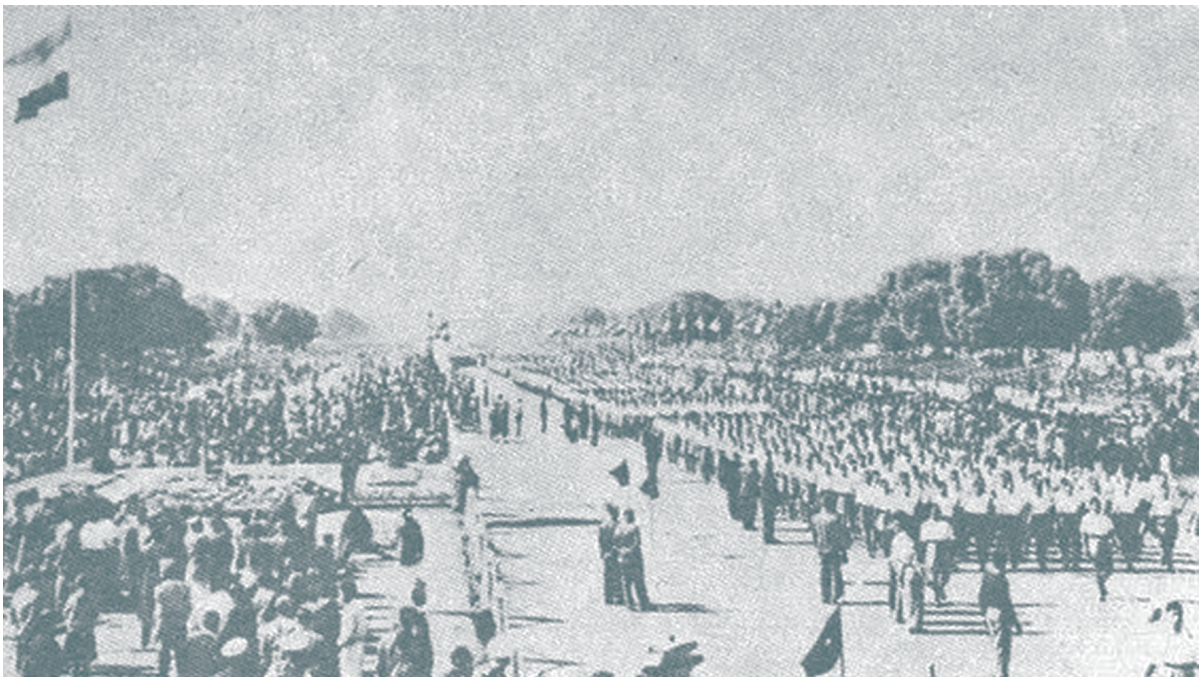

সাধারণতন্ত্র দিবস ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

ড. শ্রীরঙ্গ গোডবোলে

(দ্বিতীয় ভাগ)

বছরের পর বছর ব্রিটিশের কাছে আবেদন-নিবেদন করে এবং ডমিনিয়ন স্টেটাসের ধারণা নিয়ে নানারকম পরস্পর বিরোধী কথা বলে ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল যে পূর্ণ স্বাধীনতাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটি পূর্ণস্বরাজ দিবস হিসেবে পালিত হবে। পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখা প্রতিটি দেশভক্তের কাছে এই খবর ছিল হৃদয়স্পর্শী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ছিলেন এমনই এক দেশভক্ত।

২৬ জানুয়ারি নিয়ে সঙ্ঘের প্রথম সংকেত

বেড়ে ওঠার দিনগুলি থেকেই ডাক্তারজী (ডাঃ হেডগেওয়ার) ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রবল সমর্থক। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ তিনি অবলম্বন করেছিলেন। তারপর অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের রাজনীতিও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু দেশগড়ার কাজের জন্য তিনি হিন্দু সংগঠনের ওপর জোর দিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হলো। কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবি করায় ডাক্তারজী খুবই খুশি হয়েছিলেন। ডাক্তারজী মনে করতেন স্বয়ংসেবকেরা সঙ্ঘের নাম ব্যবহার না করে যে-যার ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে-কোনও জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তিনি মনে করতেন সঙ্ঘ হিন্দু সমাজ সংগঠনের জন্য প্রতিষ্ঠান। সেই কারণেই তিনি চাননি সঙ্ঘ সাংগঠনিক ভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুক। তবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে তিনি এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে সঙ্ঘের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বদল করতে দ্বিধা করেননি।

১৯৩০ সালের ২১ জানুয়ারি, স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে মারাঠী ভাষায় লেখা একটি চিঠিতে ডাক্তারজী লিখলেন, ‘এ বছর কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলেছে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৬.১.৩০ দিনটি সারা দেশজুড়ে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করেছে। আজ আমাদের সত্যিই আনন্দের দিন, কারণ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় আমাদের সকলের ভাবনার কথা বলতে শুরু করেছে। এই লক্ষ্য মাথায় রেখে কাজ করছে, এমন সংগঠনের সঙ্গে আমাদের সকলের সহযোগিতা করা উচিত। তাই, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিটি শাখার স্বয়ংসেবকেরা নির্দিষ্ট সঙ্ঘস্থানে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় সমবেত হবেন এবং রাষ্ট্রীয় পতাকা অর্থাৎ গৈরিক ধ্বজকে প্রণাম করবেন। স্বাধীনতার অর্থ এবং একমাত্র স্বাধীনতাই যে এখন প্রত্যেক ভারতবাসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত— এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে কোনও কার্যকর্তা বক্তব্য পেশ করবেন। পূর্ণ স্বরাজের দাবি তোলার জন্য

জাতীয় কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হবে (সঙ্ঘ অভিলেখ্যাগার, হেডগেওয়ার পেপার্স, আ পত্রক বাই ডাঃ হেডগেওয়ার টু দ্য স্বয়ংসেবক— ২১ জানুয়ারি, ১৯৩০)।

চিরকালের নিয়মনিষ্ঠ ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর চিঠির পাদটীকায় একটি নোট দিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন, প্রতিটি অনুষ্ঠানের বিস্তারিত রিপোর্ট যেন তাঁকে অবিলম্বে পাঠানো হয়। সেই পাদটীকাকে ধন্যবাদ! কারণ সেইসব রিপোর্ট আজও সঙ্ঘের অভিলেখ্যাগারের রেজিস্টারে সংরক্ষিত রয়েছে। একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে, সেই সময় সঙ্ঘের অস্তিত্ব মোটামুটি সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মারাঠী ভাষাভাষী অঞ্চল অর্থাৎ নাগপুর, ওয়ার্ধা, চান্দা (এখনকার চন্দ্রপুর) ও ভাণ্ডারায় সীমাবদ্ধ ছিল। কাছাকাছির মধ্যে অমরাবতী, বালঢানা, আকোলা ও ইয়াবতমল জেলাতেও সঙ্ঘের অস্তিত্ব তেমন কিছু ছিল না। ডাক্তারজীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি শাখায় স্বাধীনতা দিবস পালনের কার্যক্রম আয়োজন করা হয় এবং কার্যক্রমের শেষে কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। নাগপুরের সঙ্ঘস্থানে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩০, স্বাধীনতা দিবস পালনের কার্যক্রম চলেছিল সন্ধে ৬টা থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিশ্বনাথ বিনায়ক কেলকর। প্রধান বক্তা ছিলেন নারায়ণ বৈদ্য। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তারজী, লক্ষ্মণ বাসুদেও পরাঞ্জপে (এই লক্ষ্মণ বাসুদেও পরাঞ্জপে ১৯৩০ সালে ডাক্তারজী জেলে চলে যাবার পর সঙ্ঘের আপৎকালীন সরসঙ্ঘচালক হয়েছিলেন), নভথি ও ভাণ্ডারার সঙ্ঘচালক আইনজীবী দেও, সাকোলির সঙ্ঘচালক আইনজীবী পাঠক এবং সাওনারের সঙ্ঘচালক আমবোকার।

চান্দার কার্যক্রম

চান্দায় সঙ্ঘ যে কার্যক্রমের আয়োজন করেছিল তার বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া যায় (সঙ্ঘ অভিলেখ্যাগার, হেডগেওয়ার পেপার্স, রেজিস্টার, ও DSC-- 0044, DSC-- 0045)। ২৯ জানুয়ারি, ১৯৩০, সঙ্ঘের চান্দা শাখার কার্যবাহ রামচন্দ্র রাজেশ্বর ওরফে, আতিয়াজী দেশমুখ ডাক্তারজীকে এই রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলেন, 'আমাদের শাখায় এই কার্যক্রম করার সিদ্ধান্ত আমরা আগেই নিয়েছিলাম। আপনার নির্দেশ সংবলিত চিঠি পেয়েছি পরে। সেই মতো, স্বাধীনতা দিবস পালনের উদ্দেশে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়েছে। (১) কংগ্রেস সচিবের অনুরোধ ক্রমে সকাল ৮.৪৫ মিনিটে গান্ধীচক থেকে সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলায় স্বয়ংসেবকদের শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের পর সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান স্বয়ংসেবকেরা। শোভাযাত্রা সঙ্ঘস্থানে ফিরে এলে গৈরিক ধ্বজকে প্রণাম জানানো হয়। সকালের অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই। (২) সন্ধ্যেবেলায় কংগ্রেসের শোভাযাত্রায় এবং পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ হবার সময় সঙ্ঘকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু সঙ্ঘের কার্যক্রম যেহেতু আগেই ঠিক হয়ে রয়েছে, তাই, চান্দা শাখার কার্যবাহ কংগ্রেসের সচিবকে সঙ্ঘের অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। (৩) স্বাধীনতা দিবস পালনের অনুষ্ঠান সন্ধ্যে ৪.৩০ মিনিটে সঙ্ঘের নিজস্ব প্রাঙ্গণে শুরু হয়। কেশবরাও বোড়াকে বন্দুক ও লাঠি হাতে নানারকম কসরত করেন। প্রদর্শিত হয় সামরিক ড্রিলও। তারপর, সঙ্ঘচালকের নির্দেশে বিশিষ্ট আইনজীবী দেশমুখ (কার্যবাহ) সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তার বক্তব্য ছিল প্রেরণাদায়ক।

প্রস্তাব সমর্থন করেন আরেক বিশিষ্ট আইনজীবী ভাগবত। তিনিও নাতিদীর্ঘ কিন্তু মনোগ্রাহী বক্তব্য পেশ করেন। দুই বক্তাই বলেন পূর্ণ স্বরাজের দাবি তখনই কার্যকরী হয়ে উঠবে যখন তা নিয়মানুগ ও যুক্তিসংগত পথে পরিচালিত হবে। যখন যুব সমাজের মধ্যে দায়বদ্ধতা দেখা যাবে। যখন তারা পূর্ণ স্বরাজের ভাবনাকে রূপ দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে। সঙ্ঘ এ ব্যাপারে আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় দেশমুখ বলেন কংগ্রেস কীভাবে আবেদন-নিবেদন ও ডমিনিয়ন স্টেটাস অর্জনের ভ্রান্তনীতি ত্যাগ করে পূর্ণ স্বরাজের মাহাত্ম্য অবশেষে বুঝতে পেরেছে। কংগ্রেসের এই বিলম্বিত বোধোদয়ের অনেক আগেই, সঙ্ঘ পূর্ণ স্বরাজকে তার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। তাই সঙ্ঘ কংগ্রেসের এই দাবির মধ্যে কোনও মহত্ত্ব খুঁজে পায় না। তবে, এতৎসত্ত্বেও কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজকে তাদের একমাত্র দাবি হিসেবে ঘোষণা করায় সঙ্ঘ আনন্দিত এবং এই কারণে সঙ্ঘ কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চায়। দেশমুখজীর বক্তব্য শেষ হবার পর সভাপতি উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। সঙ্ঘের প্রার্থনার মাধ্যমে কার্যক্রম শেষ হয়। ১১০ জন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। যে প্রস্তাব গৃহীত হয় বাংলা তর্জমায় তা মোটামুটি এইরকম— 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য হিসেবে স্থির করায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সঙ্ঘের নিজস্ব নিয়ম ও আদর্শ অনুসারে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হলে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার ব্যাপারে সঙ্ঘ

With Best Compliments from -

A Well Wisher

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

২৬ জানুয়ারি সঙ্ঘের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার

(১) স্থান ও সময় : রাজেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণ, আকোলা, রাত ৯টা। উপস্থিতি : ৩৫ জন।

প্রধান বক্তা : গোপলকৃষ্ণ বিটালে (সঙ্ঘচালক) ও আইনজীবী সদাশিব কেলকর, কার্যক্রম :ধ্বজ প্রণাম।

(২) স্থান ও সময় : আর্বি (জেলা ওয়ার্ধা) সঙ্ঘস্থান, বিকেল ৪টে, উপস্থিতি : ৫৫ জন।

প্রধান বক্তা : পরশরাম থাউে,

কার্যক্রম : সমবেত কণ্ঠে গান, বক্তরা তাদের বক্তব্যে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের ওপর জোর দেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আইন অমান্য কর্মসূচি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। কংগ্রেস সচিব বলিরাম জালিত ও আর্বি তালুক কংগ্রেসের সভাপতি এন.এস দেশমুখের অনুরোধে স্বয়ংসেবকেরা কংগ্রেসের শোভাযাত্রায় যোগ দেন। সামরিক কায়দায় সেই শোভাযাত্রা গান্ধীচকে পৌঁছয়।

(৩) স্থান ও সময় : ভাণ্ডারা সঙ্ঘস্থান, সন্ধ্যে ৬টা।

উপস্থিতি : ৫৫-৬০ জন।

প্রধান বক্তা : বাওয়াজী কোলটে।

কার্যক্রম : স্বয়ংসেবকেরা ছাড়াও ১০ জন সাধারণ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

(৪) স্থান ও সময় : বিলাসপুর জিমনাসিয়াম, ছাতাপাড়া, সন্ধ্যে ৫টা।

উপস্থিতি : কোনও তথ্য নেই।

প্রধান বক্তা : রামচন্দ্র অনন্ত নালকর (সঙ্ঘচালক)।

কার্যক্রম : স্বয়ংসেবকেরা ছাড়াও সঙ্ঘের আদর্শে বিশ্বাসী অনেক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটে সভার আয়োজন করেছিল কংগ্রেস।

(৫) স্থান ও সময় : ব্রহ্মপুরী (চান্দা জেলা) সঙ্ঘস্থান।

উপস্থিতি : ১০২ জন (এর মধ্যে ১০ জন সঙ্ঘে নবাগত)।

প্রধান বক্তা : নীলকান্ত কৃষ্ণ সাদাফল (সঙ্ঘচালক)।

কার্যক্রম : ১৫ জন সাধারণ গ্রামবাসী সঙ্ঘের কার্যক্রমে যোগ দেন। কংগ্রেস সভাপতির বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়। বক্তাদের বক্তব্যের প্রধান বিন্দু ছিল সঙ্ঘের কাজ মানে দেশের কাজ। গৈরিক ধ্বজোত্তোলন ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এরপর ধ্বজ প্রণাম। সবশেষে দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে এক মাইল লম্বা রুটমার্চ।

(৬) স্থান ও সময় : চান্দা সঙ্ঘস্থান।

উপস্থিতি : ১১০ জন।

প্রধান বক্তা : আইনজীবী রামচন্দ্র রাজেশ্বর দেশমুখ ও নারায়ণ পাণ্ডুরং ভাগবত।

কার্যক্রম : ব্রহ্মপুরীর মতোই।

(৭) স্থান ও সময় : চিমুর (চান্দা জেলা) সঙ্ঘস্থান, সন্ধ্যে ৬ টা।

উপস্থিতি : কোনও তথ্য নেই।

প্রধান বক্তা : বাবুরাও বেড়াগে (কম্যান্ডার)।

কার্যক্রম : ভাষণ, কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব পাশ, প্রার্থনা, শ্রীবেঙ্কটেশ মন্দির অভিমুখে যুবকদের শোভাযাত্রা, ধ্বজ প্রণাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের স্লোগান।

(৮) স্থান ও সময় : হিঙ্গনঘাট (জেলা ওয়ার্ধা) সঙ্ঘস্থান, সন্ধ্যে ৬টা।

উপস্থিতি : ১০০ জন।

প্রধান বক্তা : ডাঃ শিবাজীরাও গণেশ, পটবর্ধন, ড. কুণ্ডে (সঙ্ঘচালক)।

কার্যক্রম : সর্বমোট ২০০ জন শ্রোতার উদ্দেশে ভাষণ, দেশাত্ববোধক গান, বন্দে মাতরম্ ধ্বনি, প্রার্থনা, ধ্বজ প্রণাম।

(৯) স্থান ও সময় : লাডকি (জেলা ওয়ার্ধা) সঙ্ঘস্থান, সন্ধ্যে ৬টা।

উপস্থিতি : কোনও তথ্য নেই।

প্রধান বক্তা : শঙ্কর দাজিবা আনন্দকর ও পুণ্ডলিক গোবিন্দ শিরপুরে।

কার্যক্রম : সভাপতি শিরপুরে সঙ্ঘকে একটি বিউগিল দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

(১০) স্থান ও সময় : নাচনগাঁও (জেলা ওয়ার্ধা), সন্ধ্যে ৬টা।

উপস্থিতি : কোনো তথ্য নেই।

প্রধান বক্তা : বিশ্বনাথ রঙ্গনাথ ওরফে ভাউ দাদাজী পুরাণিক (সঙ্ঘচালক)।

কার্যক্রম : সকাল ৮.৩০ থেকে ১০.৩০ সঙ্ঘের শোভাযাত্রা, সন্ধ্যে ৬টায় ধ্বজপ্রণাম, রাত ৯টা থেকে ১০.৩০ ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল স্কুলে 'স্বাধীনতা ও দেশের প্রতি কর্তব্য' বিষয়ে আলোচনা।

(১১) স্থান ও সময় : পাউনার (জেলা ওয়ার্ধা)।

উপস্থিতি : কোনও তথ্য নেই।

প্রধান বক্তা : সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তারা।

কার্যক্রম : গৈরিক ধ্বজকে প্রণাম, প্রার্থনা।

(১২) স্থান ও সময় : সেলু (জেলা ওয়ার্ধা) সঙ্ঘস্থান।

উপস্থিতি : কোনও তথ্য নেই।

প্রধান বক্তা : গণেশ বাপুজী যোশী (সঙ্ঘচালক)

কার্যক্রম : ধ্বজপ্রণাম, সঙ্ঘস্থানে প্রার্থনা, সারদা মন্দির লাইব্রেরিতে ভাষণ।

(১৩) স্থান ও সময় : ওয়ার্ধা সঙ্ঘস্থান, সন্ধ্যে ৬টা।

উপস্থিতি : কোনও তথ্য নেই।

প্রধান বক্তা : মোতিচন্দ্র জয়চন্দ্র শ্রাবাণে, দত্তাত্রেয় দেশমুখ।

কার্যক্রম : সাপ্তাহিক শ্রদ্ধানন্দ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের ব্যাখ্যা করা হয়, বাগীশ্বরী পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও রচনা পাঠ করে শোনানো হয়।

সুতরাং বোঝই যাচ্ছে সমালোচকেরা বাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করে না বলে যে অভিযোগ করেন তার কোনও ভিত্তি নেই। বস্তুত ২৬ জানুয়ারি দিনটি স্বাধীনতা দিবস বা সাধারণতন্ত্র দিবস— যে নামেই পালিত হোক সঙ্ঘের সঙ্গে দিনটির সম্পর্ক একেবারে শুরু থেকে। □

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামীজী মিলন মেলা

গত ১১ থেকে ১৫ জানুয়ারি বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পাঁচদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হলো উত্তর কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতি ও কালী সিংহ পার্কে। ১১ জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ। সম্মানিত অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশিস গিরি। সংগীত সম্মানে ভূষিত করা হয় কত্থক নৃত্যসাধিকা অধ্যাপিকা অমিতা দত্তকে। বিভিন্ন দিনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করেন স্বামী বিদ্যানন্দ, পল্লবী বসুদত্ত, কিঙ্কর শ্যামানন্দ, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত, স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দ, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, সুপ্রতীপ চক্রবর্তী, স্বামী সিদ্ধেশানন্দ, স্বামী একচিত্তানন্দ এবং কর্নেল সব্যসাচী বাগচী। বিশেষ অতিথিদের হাতে স্মারক ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন সুভাষ ভট্টাচার্য, গোপাল কুণ্ডু, ভরত কুণ্ডু, ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, ডাঃ তপন পাল ও সুদীপ দত্ত। শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করেন সোহিনী রায় চৌধুরী (খেয়াল), মধু বর্মন ও গোপাল বর্মন (তবলা-শ্রীখোল), সুদীপ পাল (ধ্রুপদ), অয়ন সেনগুপ্ত ও সৃজনী ব্যনার্জি (সেতার), বিশোক শীল (রুদ্রবীণা) এবং স্বামী কৃপাকরানন্দ (রাগাশ্রয়ী ভক্তি সংগীত)। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ পাঠচক্র সংগীতগোষ্ঠী, সংস্কার ভারতী উত্তর কলকাতা জেলা, বেহালা কেন্দ্র ও সংগীত গোষ্ঠী, তরুণ কুমার দাস, গীতমঞ্জরী ও পুনশ্চ। গৌড়ীয় নৃত্য পরিবেশন করেন কাবেরীকর পুইতণ্ডী ও সহশিল্পী, নৃত্যালেখ্য পরিবেশন করে বিবেকানন্দ পাঠচক্র। কত্থকনৃত্য পরিবেশন করেন শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়। আনন্দমঠ নাটক পরিবেশন করে সংস্কার ভারতী রেপার্টরি। ১৪ জানুয়ারি বীরপূজা অনুষ্ঠানে লাঠিখেলা প্রদর্শন করে গোপীমোহন সব পেয়েছির আসর এবং ক্যারাটে ও কালারিপায়াট্টু প্রদর্শন করে শিবুচো সেনসাই শ্রীজিৎ পাল ও সহগোষ্ঠী।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আউট্রাম ঘাট সেবা শিবিরের উদ্‌ঘাটন

গত ১১ জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের সহায়তার জন্য আউট্রাম ঘাট সেবা শিবিরের উদ্‌ঘাটন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বারকাপ্রসাদ ডাবরীওয়াল। উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিষাচার্য রাকেশ পাণ্ডে, বিশিষ্ট সমাজসেবী যশবন্ত সিংহ, স্বামী সদাত্মানন্দ মহারাজ, সমাজসেবী মোহনলাল পারীক, মুলতান পারীক। অনুষ্ঠানের শুরুতে গায়ত্রী পরিবারের দ্বারা গঙ্গা আরতি সম্পন্ন হয়। মহাবীর বাজাজ জানান, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই শিবিরে প্রতিদিন তিনহাজার তীর্থযাত্রীর নিঃশুল্ক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

ইন্দোরে সপ্তদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন

পিআইবি॥ মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে পালিত হলো তিনদিন ব্যাপী সপ্তদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন। ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোরে। এবারের সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল, 'অভিবাসী : অমৃতকালে ভারতের উন্নয়নে আস্থাশীল অংশীদার '। ৭০টি দেশের ৩৫০০ প্রবাসী ভারতীয় দেশের অমৃতকালে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন' ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প। বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই মঞ্চ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভারতের অগ্রগতি প্রসঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়রা নিজেদের মত বিনিময়ের সুযোগ পান। গত ৮ জানুয়ারি যুব প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। ভারতের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয় সম্মেলনের এই ভাগটি। এদিন সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাংসদ জেনেটা ম্যাসকারেনহ্যাস।

৯ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গিয়ানার রাষ্ট্রপতি ড. মোহামেদ ইরফান আলি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সুরিনামের রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকা প্রসাদ সান্তোখী। এছাড়াও ছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। ভারতের দক্ষ মানব সম্পদের প্রবাসী হয়ে যাওয়ার গুরুত্বের কথা তুলে ধরতে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। ডাকটিকিটের বিষয় ছিল, 'সুরক্ষিত যায়ে, পরীক্ষিত যায়ে'। এদিন প্রথম ডিজিটাল প্রবাসী ভারতীয় দিবস প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীর বিষয়, ''আজাদি কা অমৃত মহোৎসব : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকা''। ১০ জানুয়ারি সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের নিয়ে বিশেষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পিআইবি॥ গত ৭ জানুয়ারি ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মুখ্যসচিবদের নিয়ে বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করে কেন্দ্র সরকার। দিল্লিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্মেলনে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণমান বজায় রাখার গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও সমন্বয়— এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের বিশেষ আলোচনা হয়। মুখ্যসচিবদের সঙ্গে সম্মেলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁর টুইটবার্তায় বলেন, ''গত দু'দিন ধরে আমরা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুখ্যসচিবদের সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আজকের আলোচনায় ভারতের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।''

সম্মেলনে শিল্পোদ্যোগের সম্ভাবনার উপর জোর দেওয়া হয়। কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, 'আমোদের অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগী সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য এবং দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে স্থানীয় স্তরে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে অর্তনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণমান বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।''

রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অর্থহীন নিয়মকানুন ও সেকেলে আইন বাতিল করা নিয়ে মুখ্যসচিবদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত যখন এক অভূতপূর্ব সংস্কারের দিকে চলেছে, এই সময়ে এ ধরনের নিয়মের বেড়াজালে আটকে থাকা নিরর্থক। তিনি এদিনের সম্মেলনে ' পিএম গতি শক্তি' প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে 'মিশন এলআইএফই'কে আরও কার্যকর করে তোলার ওপর জোর দেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে জোর দিচ্ছে মোদী সরকার : ভূপিন্দর যাদব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নে দায়বদ্ধ। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রের এই উদ্যোগে অসংগঠিত ক্ষেত্র-সহ কর্মচারীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী রূপ নেবে।'' গত ১৫ জানুয়ারি ত্রিপুরায় একটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে একথা বলেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ভূপিন্দর যাদব। এদিন ত্রিপুরায় ১০০ শয্যার কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ইএসআইসি) হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠিত হয়। নতুন দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভূপিন্দর যাদব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা।

পাঁচ একরের বেশি জমি নিয়ে ত্রিপুরার আগরতলায় প্রস্তাবিত ১০০ শয্যার এই হাসপাতাল তৈরি করা হবে, যার পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি থাকবে ইসিআইসি'র হাতে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এটি নির্মাণ করা হবে। সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। সমস্ত আধুনিক সুবিধা সংবলিত এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম বিশিষ্ট এই হাসপাতালে মডিউলার অপারেশন থিয়েটার ও পরীক্ষাগার থাকবে। এছাড়াও বহির্বিভাগীয় ও অন্তর্বিভাগীয় পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থাও থাকছে। আগরতলা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার ৬০ হাজারেরও বেশি সুবিধাভোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সদর্থক উদ্যোগে শ্রমীক, কর্মচারী ও বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষেরা উপকৃত হচ্ছেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত হাসপাতালের জন্য পাঁচ একর জমি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দান করেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস, ইএসআইসি'র মহানির্দেশক ডাঃ রাজেন্দ্র কুমার। এছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি এবং সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

মুম্বাইয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

পিআইবি॥ গত ১৯ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে ৩৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি 'পিএম স্বনিধি' যোজনায় ১ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীর হাতে অনুমোদিত ঋণের অর্থ হস্তান্তর করেন। এছাড়াও মুম্বাই মেট্রো রেলের ২এ এবং ৭ নম্বর লাইন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। পাশাপাশি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাসের সংস্কার প্রকল্পের এবং সাতটি নিকাশি প্লান্টের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই একই অনুষ্ঠানে তাঁর হাত দিয়ে ২০টি 'বালাসাহেব ঠাকরে আপনা দাওয়াখানা'র উদ্বোধন ও মুম্বাইয়ে ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ককে কংক্রিটে মুড়ে দেওয়ার প্রকল্পের সূচনা হয়েছে।

এদিন সমস্ত প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ''স্বাধীনতার পর এই প্রথম স্বপ্নকে বাস্তবে পূরণ করার সাহস দেখালো ভারত। আগে ভারতের দারিদ্র নিয়েই শুধু আলোচনা হতো এবং সারা বিশ্বের কাছে সাহায্যের জন্য হাপিত্যেশ করতে হতো। এই প্রথমবার বিশ্বমঞ্চে ভারতের নতুন পরিচয় তৈরি হয়েছে। আজ ভারত যা সিদ্ধান্ত নেয়, সারা বিশ্ব তার দূরদর্শিতাকে সম্মান করে।'' কোভিড ও তার পরবর্তী ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি জানান, দেশের উন্নয়নের পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে ভারতবাসী এক উন্নত রাষ্ট্রের জন্য অপেক্ষা করছে আর সারা বিশ্বও একই উৎসাহে উন্নত ভারতের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ইতিবাচক এই মানসিকতার একমাত্র কারণ ভারত তার দক্ষতাকে শুভ কাজে ব্যবহার করে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন দুর্নীতির কথা স্মরণ করে বলেন, ''বিগত দিনে মুষ্টিমেয় রাজনীতিকদের দুর্নীতির জন্য দেশের কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ আমরা শপথ নিয়েছি ভারতকে দুর্নীতি মুক্ত করব। ভারতের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করছে বর্তমান সরকার।''

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিংহ কোশিয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল প্রমুখ।

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২৯।।

মহানামব্রতজী বললেন, আমেরিকা তাঁকে যেতেই হবে। না হলে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই বলে ধরে নিতে হবে। ম্যানেজার প্রথমে টেলিফোনে লিভারপুল অফিসে কথা বললেন। কোনো ফল হলো না। তখন টিকিটটা নিজের কাছে রেখে তিনি পরের দিন সকালে মহানামব্রতজীকে আসতে বললেন।

মহানামব্রতজী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে শিকাগো যাওয়ার পথে দুস্তর বাধায় ক্লান্ত হয়ে, হতাশ হয়ে প্যারিসের পথের ধারে বসে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলেন।

(ক্রমশ)